গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৬ বর্ষ ৯ সংখ্যা ২৭ সেপ্টেম্বর - ৩ অক্টোবর, ২০১৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

জনতার দাবি নিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর মহামিছিল

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন,

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের একের পর এক জনবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপ সারা দেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গেও মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। জনগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, তাঁরা আন্দোলনের প্রত্যাশায় উন্মুখ। নারী নিগ্রহ দিনের পর দিন বাড়ছে। এর বিরুদ্ধে সরকারের কোনও তৎপরতা নেই। অশ্লীল বিজ্ঞাপন, সিনেমা, ব্লু-ফিল্ম, মদ-গাঁজা-মাদকের অবাধ প্রসার এই প্রবণতাকে আরও বাড়াচ্ছে। সরকার এর বিরুদ্ধে কিছু করা দূরে থাক, এগুলি বাড়তেই সাহায্য করছে। নারী সম্পর্কে যে মর্যাদাময় ধারণা এ দেশের মনীষীরা অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, তা ছাত্র-যুবকদের মধ্যে প্রসারিত করার কোনও প্রচেষ্টাই সরকারের নেই। নারী যেন এ দেশে পুরুষের লালসার সহজলভ্য শিকারে পরিণত হয়েছে। কোনও অসহায় মহিলাকে দেখলেই তাঁর উপর নির্যাতন চালানো, এমনকী হত্যা করা যেন খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। সরকার নীরব দর্শক মাত্র। ক্ষমতাসীন দল এই নির্যাতনকারী, হত্যাকারীদেরই বহু জায়গায় মদত দিতে তৎপর।

এর সঙ্গে চলেছে সীমাহীন মূল্যবৃদ্ধি। খাদ্যসামগ্রী এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করলে দাম কমানো যেত। মুনাফাখোর, মজুতদারদের জব্দ করা যেত। আমরা দীর্ঘ দিন ধরেই এই দাবি তুললেও কোনও সরকার কর্ণপাত করছে না। কারণ এই মজুতদার, ফাটকাবাজদের দেওয়া লক্ষ লক্ষ টাকায় সরকারি দলগুলি ভোট বৈতরণী পার হয়। তাই এদের গায়ে তারা হাত দিতে পারে না। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলির স্বার্থে পেট্রল-ডিজেলের দাম প্রায় প্রতি সপ্তাহে বাড়িয়ে চলেছে। কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের হাত ধরে প্রতি মাসে বাড়ছে বিদ্যুতের দাম।

শিক্ষাক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত এ রাজ্যের সাত কোটিরও বেশি নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান সাধারণ স্কুলে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সর্বনাশ করছে। ব্যাপক হারে শিক্ষার ফি বাড়ছে। স্কুল স্তরে যৌন শিক্ষা যেভাবে চালু করে ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতন ঘটানো হচ্ছে।

গ্রাম শহরে ভয়াবহভাবে বেড়েছে বেকারি। বেকারদের কাজের ব্যবস্থা দূরস্থান, সরকার এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের নামে বেকারদের প্রতারণা করছে। চাষের উপকরণ সস্তায় দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা সরকার করেনি, চাষির ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়ার জন্য সরকারের কোনও মাথাব্যথা

দুয়ের পাতায় দেখুন

এলাহাবাদে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাগরিক সম্মেলন

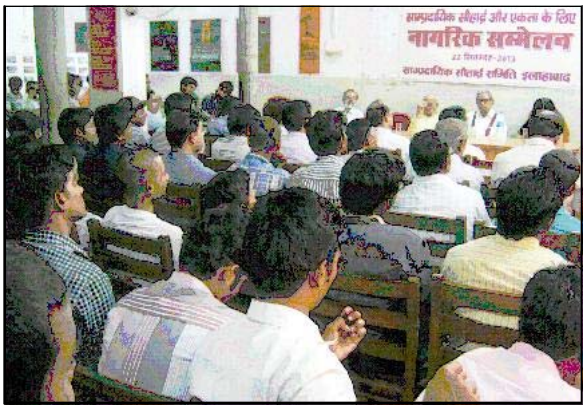

উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রীতির আহ্বান নিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদের মহাত্মা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাঘরে এক নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সামসুর রহমান ফারুকি। সভাপতিত্ব করেন জিয়াউল হক। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সুধাংশু কুমার মালব্য প্রমুখ।

আর্থিক সংকটের অজুহাতে জারি হল নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা

জাতীয় জীবনে বেকারত্বের দুঃসহ অভিশাপ আরও ঘনীভূত করল কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। ১৮ সেপ্টেম্বর এক ফরমান জারি করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের ব্যয় বিভাগ ঘোষণা করেছে, কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরগুলির যে সব পদ এক বছর ধরে শূন্য রয়েছে সেগুলিতে একান্তই প্রয়োজন ব্যতীত এবং কেন্দ্রীয় ব্যয় বিভাগের আগাম অনুমোদন ছাড়া নিয়োগ বন্ধ করা হল। রাজকোষ ঘাটতির দোহাই দিয়ে, ব্যয় সংকোচের অজুহাতে দেশের কোটি কোটি বেকারের সামনে 'নো রিক্রুটমেন্ট'-এর নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

'একান্তই প্রয়োজন ব্যতীত' এবং 'আগাম অনুমোদন' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে পদগুলি একদা প্রয়োজনেই তৈরি হয়েছিল এবং তাতে নিয়োগ করেই প্রয়োজন মেটানো হয়েছিল, আজ সেই পদগুলিতে নিয়োগ সরকার তেমন জরুরি প্রয়োজন মনে করছে না। এইখানেই রয়েছে এক গুরুতর বিপদ। কেন্দ্রীয় সরকার ডাউনসাইজিং বা কর্মী ও কর্ম সংকোচনের যে সর্বনাশা নীতি নিয়ে চলছে এই ফরমান তারই অনুসারী। ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই পদগুলি বিলোপের সমূহ বিপদ দেখা দিয়েছে। গত এক দশকে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই বিলোপ হয়েছে ৪ লক্ষ শূন্যপদ। ২০১১ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের হিসাবে শূন্য পদের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৯১। সব মিলিয়ে পদ বিলোপের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১০ লক্ষ। এই নিষেধাজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে, পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বহির্ভূত কোনও ক্ষেত্রেই নতুন পদ সৃষ্টি করা যাবে না। ফলে বেকারদের চাকরি পাওয়ার সামনে গুরুতর বিপদ সৃষ্টি হল।

এমনিতেই দেশে শিল্পায়ন নেই। স্বাধীনতার পর যে শিল্পগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলির অনেকই আজ বন্ধ। যেগুলি আজও টিকে আছে সেগুলির শ্রমনিবিড় চরিত্র বদলে যাচ্ছে। শ্রমিকের স্থান নিচ্ছে উন্নত প্রযুক্তি। যন্ত্র বসিয়ে শ্রমিকের কর্মভার লাঘব করে শ্রমিককে স্বস্তি দেওয়া নয়, উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে মুনাফা বাড়াতেই যন্ত্রীকরণ ঘটছে। সর্বোচ্চ মুনাফার যে নীতি নিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা চলছে, তা প্রতিনিয়ত জন্ম দিচ্ছে বাজার সংকটের, যা পরিবর্ধিত হয়ে জন্ম দিচ্ছে মন্দার। দেশের ভেতরে এবং বাইরে এই মন্দাই শিল্পায়নের সামনে প্রধান বাধা হিসাবে

দুয়ের পাতায় দেখুন

মহামিছিলের দেওয়াল লিখন। স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে মহানগরীর রাজপথে

নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি

একের পাতার পর

দাঁড়িয়ে আছে। ফলে এখানে নতুন করে শিল্পায়ন হওয়া সম্ভব নয়। ভোটের স্বার্থে বিভিন্ন রাজ্য সরকার শিল্পায়নের ধুয়ো তুলছে ঠিকই, কিন্তু তার দ্বারা শিল্পায়ন সম্ভব নয়। হচ্ছেও না। একটা-দু'টো শিল্প দেশের কোথাও হয়ত গড়ে উঠছে, কিন্তু বন্ধ হচ্ছে তার চেয়েও অধিক সংখ্যক। ফলে শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমাগত কমছে।

সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের যে সুযোগটুকু ছিল সেটাও নানা অজুহাতে সংকুচিত করা হচ্ছে। আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে রেলে যত কর্মচারী কাজ করত, আজ রেল ব্যবস্থা আরও প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও কর্মচারীর সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে। হাজার হাজার পদ অবলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত সরকারি দপ্তরে একই চিত্র। অজুহাত দেওয়া হচ্ছে অর্থসংকটের। কিন্তু অর্থ সংকট ঘটছে কেন? কেন রাজকোষ ঘাটতি? কই, পুঁজিপতিদের 'ত্রাণ প্যাকেজ' দিতে গিয়ে সরকার তো রাজকোষ ঘাটতির কথা বলে না? যে সরকার রাজকোষ ঘাটতিতে এত উদ্বিগ্ন সেই সরকার এম পি-দের বেতন এক ধাক্কায় মাসে ৬০ হাজার টাকা বাড়ায় কোন যুক্তিতে? ভোগবিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের বেতন, ভাতা, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়ায় কী করে? কী করেই বা পুঁজিপতিদের কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দিয়ে রাজকোষ থেকে দাতব্য করে? রাজকোষ ঘাটতি নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হলে সরকারি দপ্তরে দুর্নীতি বন্ধ করতে কেন এত অনীহা? এই সরকার রাজকোষ ঘাটতির অজুহাত দিয়ে খাদ্যে ভরতুকি কমায়, ডিজেলে-সারে-রান্নার গ্যাসে ভরতুকি কমায়, অথচ পুঁজিপতিদের অনুদান দিতে, কর ছাড় দিতে, বিনামূল্যে জমি জল বিদ্যুৎ দিতে এতটুকু কার্পণ্য করে না। আসলে এখানে কাজ করছে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি। একটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সরকার মানে হল পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। যে কারণে পুঁজিপতিদের স্বার্থে সরকার দরাজ হস্ত, অথচ জনগণের জন্য তার রাজকোষ শূন্য।

শুধু কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারই নয়, রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও স্থায়ী চাকরির পদ বিলুপ্ত করছে। এই সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রীতিমতো নির্দেশনামা জারি করে অবলুপ্তি ঘটিয়েছে চারশো ডিভিশন, আপার ডিভিশন ক্লার্ক ও টাইপিস্ট পদের। পূর্ত দপ্তর এক আদেশনামায় জানিয়েছে, দপ্তরের সিভিল, রোডস ও কনস্ট্রাকশন ব্রাঞ্চের সংশ্লিষ্ট অধিকরণগুলি থেকে যথাক্রমে ৩৩, ২৫ ও ১০টি এল ডি সি পদের অবলুপ্তি ঘটানো হল। অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে ৬৮টি ইউ ডি সি পদও। ২৫২টি টাইপিস্ট পদ অবলুপ্ত হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগে আরও কুঠারাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যেমন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (এস ই)-র ৩৩৮ পদে স্থায়ী নিয়োগ হবে না, হবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ। ফলে স্থায়ী চাকরির সুযোগ আরও কমছে।

রাজ্য সরকারের ঘোষিত এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক সরকারি ক্ষেত্রে চাকরি দেবে না, বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরির কথা বলেছে। এই এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে গত এক বছরে নাম নথিভুক্ত করেছে ১৭ লক্ষের মতো যুবক। কিন্তু কাজ পেয়েছেন মাত্র ১৩৭ জন। ফলে এই সমস্ত কোনও প্রকল্পই বেকার সমস্যার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

২০১৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এ রাজ্যে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৭১.৫ লক্ষ। অনথিভুক্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যোগ করলে সংখ্যাটা কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এর বাইরেও রয়েছে স্বাক্ষরজ্ঞানহীন লক্ষ লক্ষ বেকার। বেকারত্বের দুঃসহ জ্বালা বয়ে চলেছে এই যুবসমাজ। এর বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে না ওঠার ফলেই সরকার পেয়ে যাচ্ছে চাকরি সংকুচিত করার মহা সুযোগ।

৩০ সেপ্টেম্বর মহামিছিল

একের পাতার পর

নেই। বরং চাষিকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কব্জায় আরও বেশি করে ঠেলে দিচ্ছে।

এই সর্বাত্মক সংকটের বিরুদ্ধে যাতে মানুষ রুখে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য সাধারণ মানুষের ঐক্য বিনষ্টকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী, সাম্প্রদায়িক আন্দোলনকে পুঁজিপতি শ্রেণি মদত দিচ্ছে। ভোটসর্বস্ব সমস্ত সংসদীয় দল একেই সাহায্য করছে। যে কারণে পশ্চিমবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যখন তখন মাথাচাড়া দিচ্ছে।

আজ এ কথা প্রমাণ হয়ে গেছে, যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন গণআন্দোলন ছাড়া মানুষের দাবি আদায় সম্ভব নয়। যে কথা প্রমাণ করেছে নন্দীগ্রামের এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। বহু মানুষের প্রাণ এবং দু'শোর বেশি নারীর সম্ভ্রম লুট করেও সিপিএমকে নন্দীগ্রামের দেড় লক্ষ পরিবারের জমি কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত থেকে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি চালুর দাবিতে আন্দোলনের বিজয়ের গৌরবকে এ রাজ্যের মানুষ কোনও দিন ভুলবেন না। জনগণ অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছে, অন্য দলগুলি ক্ষমতার মধুভাণ্ডের লোভে একচেটিয়া মালিক কর্পোরেট পুঁজির সেবাদাস হিসাবে কাজ করে চলেছে, শুধুমাত্র ভোট বাজারে দাম বাড়ানোর জন্য তারা মাঝে মাঝে আন্দোলনের কথা বলে। একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)ই জনস্বার্থে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আন্দোলনের একমাত্র শক্তি হিসাবে এই দলকে মানুষ চিনেছে। তাই বিগত এক মাস ধরে চলা সাত দফা দাবিপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে সাধারণ মানুষ তো বটেই, বহু তৃণমূল বা সিপিএম-এর সমর্থকও সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। ৩০ সেপ্টেম্বর লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষরিত এই দাবিপত্র নিয়ে হাজার হাজার মানুষের মিছিল মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের উদ্দেশে যাবে হেদুয়া থেকে রানি রাসমণি অ্যাভেনিউয়ে। এই সমাবেশ থেকেই শারদ উৎসবের পরে ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

লাইসেন্সের দাবিতে মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ

লাইসেন্স প্রদানের সরকারি ঘোষণা অবিলম্বে আইনসিদ্ধ করার দাবিতে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৪ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট এস ডি ও অফিসে সহস্রাধিক ভ্যানচালক বিক্ষোভ দেখান। ৫ সেপ্টেম্বর সহস্রাধিক ভ্যানচালক ব্যারাকপুর মহকুমা অফিসে, ৬ সেপ্টেম্বর পাঁচ শতাধিক ভ্যানচালক বনগাঁ এস ডি ও অফিসে এবং ১০ সেপ্টেম্বর পাঁচ শতাধিক ভ্যানচালক বারাসাত এস ডি ও অফিসে বিক্ষোভ দেখান এবং দাবিপত্র পেশ করেন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও এ আই ইউ টি ইউ সি উত্তর ২৪ পরগণা জেলা নেতৃবৃন্দ এইসব কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন।

পার্টি সমর্থকের জীবনাবসান

বর্ধমান শহরের প্রবীণ পার্টিকর্মী কমরেড এন সি রায় দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ৭ সেপ্টেম্বর বি আর সিং হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। ৬০-এর দশকে প্রয়াত নেতা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সীতেশ দাশগুপ্তের মাধ্যমে তিনি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। তিনি রেলওয়ে কর্মচারী হিসাবে রেলের কর্মচারীদের মধ্যে এ আই ইউ টি ইউ সি-র গণসংগঠন গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন এবং অচিরেই রেল শ্রমিকদের মধ্যে নেতা হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বর্ধমানে প্রথম দিকে পার্টি সংগঠন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল। বর্ধমানে ভ্যানরিক্সা চালক এবং মুড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৪ সালে ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং গ্রেপ্তার হয়ে কারাবরণ করেন। পার্টিকর্মী হিসাবে তিনি সারাজীবন ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারলেও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত পার্টি তাঁর হৃদয়ে ছিল। জুনিয়র কর্মীরা তাঁর খুব স্নেহের পাত্র ছিল।

জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুব্রত বিশ্বাস, বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড রতন কর্মকার, বর্ধমান লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এ আই ইউ টি ইউ সি জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড প্রদ্যোৎ নন্দী প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যার্পণের মাধ্যমে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডুর পক্ষেও মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় বর্ধমান লোকাল কমিটির অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

কমরেড এন সি রায় লাল সেলাম

তমলুকে ডি এম অফিসে বানভাসিদের বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট-পাঁশকুড়া-তমলুক ব্লকের প্রায় ৫ শতাধিক বানভাসি ও জলবন্দি মানুষ ১০ আগস্ট তমলুকে জেলাশাসক অফিসে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, দেহাটী-দেনান-গঙ্গাখালি খালের সম্পূর্ণ অংশ এবং সোয়াদিঘি খালের অবশিষ্টাংশ সংস্কার, ক্ষতিগ্রস্ত ধান-পান-ফুল ও বাহারি পাতা এবং মাছ চাষিদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের বিনামূল্যে সার-কীটনাশক ও বীজ বা চারা প্রদান প্রভৃতি। কৃষক সংগ্রাম পরিষদ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতি, সোয়াদিঘি ও গঙ্গাখালি খাল সংস্কার সমিতি বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছিল। অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) ও সেচ দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীরা প্রায় এক ঘন্টা হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে। অতিরিক্ত জেলাশাসক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। সেচ দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার জানান, দেনান-দেহাটী খাল সংস্কারের জন্য ২.৭৪ কোটি ও গঙ্গাখালি খাল সংস্কারের জন্য ৩.৯০ কোটি টাকার স্কিম নাবার্ডের কাছে ঋণ চেয়ে জমা দেওয়া হয়েছে।

মোটরভ্যান চালকদের হাওড়া জেলা সম্মেলন

পুলিশি জুলুম ও হয়রানি বন্ধ এবং সুষ্ঠু নীতি ও পদ্ধতি মেনে লাইসেন্সের দাবিতে ১১ সেপ্টেম্বর হাওড়ায় অনুষ্ঠিত হয় মোটরভ্যান চালকদের দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন। সম্মেলনের আগে বক্সিম সেতুর নিচে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সভাপতি কমরেড সুজিত ভট্টশালী মোটরভ্যান চালকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আন্দোলনই যে একমাত্র পথ তা বিশদে আলোচনা করেন। রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি কমরেড জৈমিনী বর্মনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেলা আর টি এ-র সাথে দেখা করে হাওড়া কমিশনারেট এলাকা সহ বিভিন্ন থানায় পুলিশি জুলুম ও হয়রানি বন্ধের দাবি জানান।

বিকালে রামগোপাল মঞ্চে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিভিন্ন স্ট্যান্ড কমিটির প্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সভাপতি কমরেড দেবাশিস রায় লাইসেন্সের সিদ্ধান্তকে সরকারিভাবে ঘোষণা এবং আইনসিদ্ধ করার দাবিতে প্রয়োজনে বাড়ির মা-বোনেদের নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। জেলার ৭টি ব্লক থেকে সাড়ে তিনশো মোটরভ্যান চালক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। কমরেড তাপস দাস ও কমরেড তাপস বেরাকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

জেলায় জেলায় অ্যাবেকার অবস্থান-বিক্ষোভ

পুনরায় বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ও বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের একের পর এক গ্রাহকস্বার্থবিরোধী রেগুলেশন ঘোষণার বিরুদ্ধে অ্যাবেকার ডাকে ১০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবাংলার এস ই ডি সি এল অফিসের ১৩৭টি গ্রুপ সাপ্লাইতে অবস্থান বিক্ষোভ ও সমাবেশ হয়। বাকি জায়গায় ১১ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। কলকাতায় সি ই এস সি-র ম্যান্ডেভিলা, তারাতলা, শ্যামবাজার রিজিওনাল অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী বলেন, এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের দাম সারা ভারতের মধ্যে সর্বাধিক। বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলি একদিকে শত শত কোটি টাকা মুনাফা লুঠছে ও অন্যদিকে একের পর এক রেগুলেশন পরিবর্তন করে মুনাফা বৃদ্ধির পাকা ব্যবস্থা করছে। এর বিরুদ্ধে জনসাধারণের থেকে সংগৃহীত মতামত পর্যালোচনা করে আগামী নভেম্বর মাসে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। এর মধ্যে বিদ্যুতের দাম বাড়লে বিদ্যুৎ ভবন এবং সি ই এস সি-তে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বাড়ানোর নামে মহাজন-ব্যাঙ্ক-দুষ্কৃতীচক্রের থাবা বিস্তারের পরিকল্পনা

সরকার এবং শিল্পপতি মহল থেকে কিছুদিন ধরে নতুন নতুন ব্যাঙ্ক চালু করার জন্য জোরালো সওয়াল চলছে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে নতুন ব্যাঙ্ক চালু করার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞরা হায় হায় করছেন। ১২০ কোটি লোকের দেশে, যেখানে দেশের অর্ধেক গ্রামেই ব্যাঙ্কের কোনও শাখা নেই, সাধারণ মানুষ বাঁচবে কোন ভরসায়? ২০১২-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রকাশিত হিসাবে পাওয়া যায়, এ দেশে মোট ব্যাঙ্ক ৮৬টা। প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টর মিলিয়ে। এর মধ্যেই রয়েছে বিদেশি ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ক, এনবিএফসি, মাইক্রো ফিনান্স প্রতিষ্ঠান সমূহ ও টার্ম লেনডিং সংস্থা। ৪০টি বিদেশি ব্যাঙ্কের ৩২৩ শাখা (অফিস) আছে। এদের আমানতের পরিমাণ ২,৭৭,০৬৩ কোটি টাকা। প্রায়োরিটি সেক্টরে ঋণদানের বাধ্যবাধকতা এদের নেই।

সম্প্রতি ২০টি এ ধরনের ব্যাঙ্ককে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের কারবারিদের ও দুর্বলতর শ্রেণির মানুষকে সহজ শর্তে ঋণের অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে। পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা ৮৩,২২৯টি। আমানতের পরিমাণ উল্লিখিত সময়ে ৬৪,৫৩,৬৬৪ কোটি টাকা। অগ্রিম অর্থ সাহায্য (অ্যাডভান্স) মোট ৫০,৭৪, ৫৭৯ কোটি টাকা (সূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ভয়েস, এপ্রিল ২০১৩)।

অভিযোগ হচ্ছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানে তার ব্যাঙ্কগুলি গ্রাহকদের যথাযথ সেবা দিতে পারে না। তারা নাকি অযোগ্য। বলা হচ্ছে, প্রতিযোগিতার সামনে এদের টিকে থাকার যোগ্যতা নেই। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ছিলেন তখন তিনি খুব 'হতাশ' হয়েছিলেন, কারণ বিভিন্ন ধরনের ভরতুকি সরকারি তরফে যে জনসাধারণকে দেওয়া হয়, তা ব্যাঙ্ক মারফত দেওয়ার উপায় নেই। কারণ তাদের নামে কোনও অ্যাকাউন্ট নেই। কারণ গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্কের শাখা নেই। তাহলে এমন এক 'দুর্গতি'র সামনে সেই ২০ বছর আগে কিছু ব্যাঙ্ককে লাইসেন্স দেওয়ার পর চুপচাপ থাকা কেন? এটা অবশ্যই কর্তাদের কথিত 'অযোগ্য' ব্যাঙ্কগুলিকে রক্ষা করার অছিলা। আগে বলা হত কর্মীসংখ্যার আধিক্য ব্যয়বাহুল্য ঘটিয়েছে। কিন্তু এখন? এখন তো কর্মীসংকোচন ও মার্জার প্রক্রিয়ায় তাগত বেড়েছে! তাহলে?

প্রথমে সরকারি ব্যাঙ্কের অযোগ্যতার কথাই ধরা যাক। কথাটি কি সত্যি? সরকারি ব্যাঙ্কের আমানত ও বিনিয়োগের (অ্যাডভান্স) যে হিসাবটা আমরা উল্লেখ করেছি, তার সাথে কর্মী পিছু ব্যবসা ১১.৩৮ কোটি টাকা, কর্মী পিছু মুনাফা ৮.১০ লক্ষ টাকা। ক্রস সাবসিডি ও নন পারফরমিং অ্যাসেট (অনাদায়ী ঋ ণ) বৃদ্ধির দায় তো কর্মীদের অযোগ্যতার ফল নয়। তা হলে ব্যাঙ্কগুলির অযোগ্যতা প্রমাণ হল কীসে? বিপুল সম্পদ যা সংগৃহীত হয়েছে, তার ৮০-৮৫ শতাংশই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। তা হলে এত সম্পদের অর্থাৎ পুঁজির পাহাড়ে বসে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কমবে কেন? সম্পদ কি মন্ত্রবলে লোপাট হয়ে প্রতিযোগিতার হিম্মত কমিয়ে দেবে? কর্মীদের যে সব সুযোগ সুবিধা ছিল, নতুন নতুন স্কিমে যেমন 'নয়া পেনশন প্রকল্প ২০১০' চালু করে সেসব সুরক্ষা ছাঁটাই করা হয়েছে। ব্যাঙ্কিংয়ের বিভিন্ন অংশ সংকুচিত করা হয়েছে। গ্রামের বেকার শিক্ষিত যুবকদের ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টিকারী উদ্যোগী, 'ব্যবসায়িক মুখপাত্র' তথা প্রতিনিধি হিসাবে নাম দিয়ে নামমাত্র নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে ব্যাঙ্কের কাজে লাগানো হচ্ছে। স্থায়ী কর্মী না বাড়িয়ে, নগণ্য সংখ্যক কর্মরতদের কাজের বোঝা বাড়িয়ে ব্যাঙ্ক তার মুনাফা তো বাড়িয়েই চলেছে! তা হলে ভয় কীসের? আবার সরকার নিজেই তো বিভিন্ন বিদেশি ব্যাঙ্কের অনুমোদন দিচ্ছে পুঁজি আসবে, প্রতিযোগিতার যোগ্যতা বাড়বে এ সব কথা বলে। মানুষকে তথাকথিত আর্থিক সহায়তা দানের প্রতিযোগিতা বাড়ানোর জন্য। এই সবই তো সরকার প্রচার করে। তা হলে সমস্যা কোথায়? ১৯৯০-এর দশকে নরসিংহম কমিটি যে প্রস্তাবগুচ্ছ দিয়েছে তার সাহায্যে নয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা উদারনীতির পরিকল্পনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যাঙ্কগুলিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। তা হলে এখন তো ব্যাঙ্ক অনেক সাবালক। 'কস্ট এফেকটিভ'। 'মুনাফা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে'!

নতুন ব্যাঙ্কের অনুমোদন দেওয়ার দাবিটা উঠছে কেন? আর ব্যাঙ্ক লাইসেন্সের ব্যাপারে এত গড়িমসিই বা কেন? বলা হচ্ছে, নানা ধরনের নন-ব্যাঙ্কিং সংস্থার দ্বারা মানুষ প্রতারিত হচ্ছে। তাকে আটকাতে হবে। গ্রামের মানুষের হাতের কাছে ব্যাঙ্ক নেই। ব্যাঙ্ককে সহজ সরল সুযোগ সুবিধা দেওয়ার আর্থিক নীতি নিয়ে গ্রামে গ্রামে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। যাতে তারা সহজে, চাষবাসের কাজে, পারিবারিক বিপদে, রোগে-ভোগে, নানা অনুষ্ঠানে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যাঙ্কের সেবা পায়। ঋণ পায়। সুলভ সুদে আমানত করতে পারে। দরকার মতো তুলতে পারে, নিজের আয়ের বেশি ক্ষতি না করে। এগুলো হলে নন ব্যাঙ্কিং সংস্থাগুলোর লাফিয়ে লাফিয়ে টাকা বাড়িয়ে তোলার ম্যাজিকের প্রলোভনে পড়ে তারা ফতুর হবে না।

শুধু এইসব নন-ব্যাঙ্কিং সংস্থাই নয়, সুদখোর মহাজনদের পাল্লায় পড়ে ঠকার বিপদও রয়েছে। কাজেই তাকে ঠেকাও। ব্যাঙ্ক খোলো নতুন নতুন। শুনলে মনে হবে মহাজনদের শোষণ থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার ব্যাপারে বুঝি দেশের কর্তারা খুব চিন্তিত। যুক্তি তোলা হচ্ছে, ব্যাঙ্ক খুললেই তো হবে না। আমানত যেমন করানো চাই, ঋণও তো দেওয়া চাই। না হলে ব্যবসা লাভজনক হবে না। আবার শুধু ঋণ দিলেও হয় না, তা সময় মতো আদায় করতে পারা চাই। অর্থাৎ, ব্যাঙ্কের দক্ষ লোকজন চাই। কাকে ঋণ দিতে হবে, কাকে দিলে ঋণ আদায় হবে না, তার বাছবিচার চাই। এতে ঝুঁকি আছে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ব্যয়ভারও আছে। কর্মক্ষেত্রের মানুষগুলো সম্পর্কে ভালো জানা বোঝা চাই। তাতেও শান্তি নেই, ঘরের শত্রু বিভীষণ আছে। এ সব ব্যাপারে গ্রামের মধ্যেই তো থাকে বিকল্প ব্যাঙ্কার। অর্থাৎ সুদের কারবারি মহাজন। দিনে রাতে যে কোনও সময় এই মহাজনের দরজা খোলা। বিপদে আপদে, আনন্দ অনুষ্ঠানে, ঘরদোর মেরামতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, চাষবাসে, সব সময়ে তারা প্রস্তুত। সাহায্যের হাত বাড়িয়েই রেখেছে। চটজলদি ব্যাপার। কিন্তু সব নিয়মের হ্যাপা ঠেলে ব্যাঙ্কের সাহায্য পেতে ভাত পান্তা হয়ে যাবে।

পুঁজির অভাব নেই বরং পুঁজির আধিক্যই সমস্যা। ব্যাঙ্ক পুঁজি ও শিল্প পুঁজি মিলিত হয়ে যে অলিগার্কি বা ধনকুবের গোষ্ঠী আর্থিক জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, তাকে ভয় পেতে হয় দেশের দারিদ্র্যকে। অর্থাৎ পরিষেবার ক্রেতা বা গ্রহীতার ক্রয়ক্ষমতার সংকটকে তথা ভয়াবহ বাজার সংকটকে। পুঁজি খাটবে কোথায়?

মহাজনরা ফসল কাটার সময়, ব্যবসা বাণিজ্যের আদায়ের উপযুক্ত সময়ে তাগাদা করে এই টাকা আদায়ও করে নেয়। তাতে হয়ত ঋণগ্রাহককে মরতে হয় বহু ক্ষেত্রে। দেউলিয়া হতে হয়। জমি বড়ি ঘর হারাতেও হয়। সুদটা ১০০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। তবে কষ্ট করে শোধ দিতে পারলে ঝামেলা নেই। এই স্থানীয় ব্যাঙ্কার মহাজনদের সঙ্গে সরকারি ব্যাঙ্ককে লড়তে হবে। পারবে কি? এই মহাজনরা ডোবে না। যদিও অনাদায়ী ঋণের বোঝায় ব্যাঙ্ক ডুবতে পারে। 'দুর্বল ব্যাঙ্ক' বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্ট্যাম্প মারা হয়ে যেতে পারে। 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। সরকারি ব্যাঙ্ক কোন ভরসায় বাড়ানো হবে?

তাই সমাধানটা আনা হচ্ছে বেশ কায়দা করে। তাকে মানিয়ে নেওয়ার পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে। যেমন বলা হচ্ছে, এক সমাধান হতে পারে বেসরকারি ব্যাঙ্ক বাড়ানোর সুযোগ কিছুটা দেওয়া, নিজেদের মুনাফার ক্ষেত্রে যতটা কম ভাগ কমে সেটা খেয়াল রেখেই। আরেকটা সমাধান হতে পারে মহাজনদের, যাদের ঋণ দেওয়া ও আদায় করার 'মেশিনারি' বা বাহুবল আছে, যারা দিনরাত মানুষের মধ্যেই আছে, তাদের যদি ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে নেওয়া যায়। যদি তাদের লাইসেন্স দিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য সুদের হারে ব্যবসা করতে সম্মত করা যায়। এমন চুক্তিতে ব্যাঙ্কের প্রক্রিয়ায় তাদের বাঁধতে পারলেই যেন সমাধান। আইনের পথে মহাজনদের এনে ফেললে লোকও বাঁচে, ব্যাঙ্কের ব্যবসাও বাঁচে। যেন মহাজনরা আইন মানলেই সব সমস্যার সমাধান।

চাই কি ব্যাঙ্কও দরকার মতো এদের পুঁজি যোগান দিতে পারে। এরাই হয়ে উঠতে পারে নয়া অর্থনীতির নয়া গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। আসলে এরাই ঘরের 'বেসরকারি ব্যাঙ্ক'। এদের জাতে তুলে নেওয়াই ভালো। তাই 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বাড়াও' প্রস্তাবের মধ্যে এমন ধরনের কারবারের ফন্দিটাও বাজারে ফেলা হচ্ছে। দেখা যাক লোকে গেলে না ওগরায়। তবে হ্যাঁ, এটা করতে হলে উপদেশ হল সংস্কারমুক্তি চাই। শত শত বছর ধরে এ দেশের মানুষের এই সব 'সুদখোর মহাজন' সম্পর্কে বিতৃষ্ণা আছে খুবই। এই মনোভাব বদলানো চাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে এমন প্রস্তাবও পাঠিয়েছিল বলে সংবাদে প্রকাশ।

এগ্রিকালচারাল ফাইন্যান্স কনসালট্যান্ট এ আর প্যাটেল বলেছেন, আমরা অতীতে নানা ধরনের পরীক্ষা করেছি, কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলোর (১৯৭১) মাধ্যমে অর্থ যোগান দিয়েছি। ফারমার সার্ভিস সোসাইটিগুলোর (১৯৭৩) মাধ্যমে অর্থ জুগিয়েছি, রিজিওনাল ও সেন্ট্রাল গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলো যা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলোর সাহায্যপ্রাপ্ত এবং অনুমোদিত (১৯৭৫)— তাদের মাধ্যমেও অর্থ সরবরাহ করেছি। কিন্তু এগুলোর কোনটারই ফলাফল যেমন ভাবা হয়েছিল তেমন প্রমাণ হয়নি। (বিজনেস ইন্ডিয়া ১৩-১৫ জুন ১৯৮৯)

কৃষিঋণ পর্যালোচনা কমিটি (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিয়োজিত) ১৯৮৯ সালে যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে দেখা যায় ৩০ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার প্রতিষ্ঠানিক ঋণের সুযোগ পায়। বাকিটা সেই মহাজন। সমবায়ের উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃষ্টতর কৃষিকাজ, প্রকৃষ্টতর ব্যবসা, প্রকৃষ্টতর জীবন যাপন। এই লক্ষ্যের পরিণতি দেখুন। এই কথাগুলোর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আমরা একটা প্রবণতা দেখাতে চাই। ১৯৯৩-৯৪ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ জনসংখ্যার মাত্র ৪৫ শতাংশ ব্যক্তি প্রাথমিক কৃষি ঋণ দান সমিতির সংস্পর্শে এসেছে। মোট সদস্য সংখ্যার ১০ শতাংশ কৃষি শ্রমিক ও গ্রামীণ কারিগর। অবহেলিত সমাজের ৫৫ শতাংশই সমবায় সাহায্য বঞ্চিত। ঋণ বেশিটাই আসে মহাজনদের কাছ থেকে। সুতরাং মহাজনদের কবল থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষের মুক্তি হয়নি। এছাড়া রয়েছে এই ধরনের সংস্থার পুঁজির অভাব এবং অনাদায়ী ঋণ। ১৯৯০-এর মার্চে দেখা যায়, অনাদায়ী ঋণ ৪১ শতাংশ। এর ৫১ শতাংশ ৩ বছরের পুরনো। উল্লেখযোগ্য ১৯৯০-১৯৯১ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতি ৮৮ হাজারে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ঋণ দেওয়া হয় স্থাবর সম্পত্তির ভিত্তিতে। মধ্যবিত্ত, দরিদ্র কৃষক কারিগর, গ্রামীণ শিল্পীর বদলে ঋণ পায় সমৃদ্ধ কৃষক, জোতদার।

১৯৯০-'৯১ সালের হিসেবে দেখা যায় যাদের জমি ২ হেক্টরের কম, তারা প্রাথমিক ঋণদান সমিতির মোট ঋণের ৩৪.৮২ শতাংশ পেয়েছিল। ২ হেক্টরের বেশির মালিকরা পেয়েছিল ৫০.৪৮ শতাংশ। ভূমিহীন, গরিব ভাগচাষিদের মতো হতভাগ্যরা পেয়েছিল ঋণের ৪.৮ শতাংশ। ধনীরাই সমবায় আন্দোলনের প্রধান সুবিধাভোগী। বিভিন্ন সময়ে ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব হলে ধনীরাই সুবিধা পায় বেশি। কিন্তু গরিবরা যেটুকু ঋণ পেল, তার ফল কী? কৃষির উপাদান সমূহ, সার, বীজ কীটনাশক ইত্যাদি মূল্যবৃদ্ধির দরুণ যে ব্যয় বৃদ্ধি হয় তা পুষিয়ে লাভজনক দামে ফসল বিক্রি করতে পারে না। এ জন্য ঋণ শোধ হয় না। আবার অভাবি বলে ব্যাঙ্কের ঋণের টাকার খাতও বদলে যায়। চাষের টাকা হয়ত ঢোকে চিকিৎসায়। ফলে ঋণ বাড়ে, অনাদায়ী ঋণের ফাঁসে সম্পত্তি যায়, জমিও যায়। যায় সেই ধনীদের হাতে, মহাজনদেরই হাতে। নাবার্ড-এর মতো সংস্থারও অনাদায়ী ঋণ ৪২ শতাংশ। রক্ষাকর্তা কোথায়? চাষিদের আত্মহত্যা বাড়ছে এ জন্যই। এ জন্যই বাড়ছে ভূমিহীন কৃষিমজুর। বাড়ছে মাইগ্র্যান্ট লেবার। নারী পাচার। কাজেই ব্যাঙ্ক ঝুঁকি নেবে কেন? ব্যাঙ্ক শাখা খুলতে চায় সম্পন্ন এলাকায়। মুনাফা সুনিশ্চিত করতে চায়। যদিও গরিবদের অনাদায়ী ঋণের পাশে কর্পোরেট হাউসের, মালিক শ্রেণির ঋণ মকুব, কারবারে উৎসাহ দানের নামে ভরতুকি ইত্যাদি ধরা হলে তা মশার পাশে হাতি বসানো হবে। এর সঙ্গে রয়েছে বড় বড় পুঁজিপতিদের, ধনীদের জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা আয়কর ছাড়। জনগণের জোগানো টাকায় মালিকদের লোকসান পুষিয়ে চাঙ্গা রাখার প্যাকেজ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের, সরকারের টাকার এখানেই হয় বিপুল অপচয়। ব্যাঙ্কিং শিল্পের প্রকৃত বিপদ এখানেই। অথচ গরিবদের ঋণ মকুব ও তাই অনাদায়ী ঋণকেই খুব বড় সমস্যা বলে দেখানো হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিপদ যা ভয়ঙ্কর তা হল — পুঁজির অভাব নেই বরং পুঁজির আধিক্যই সমস্যা। ব্যাঙ্ক পুঁজি ও শিল্প পুঁজি মিলিত হয়ে যে অলিগার্কি বা ধনকুবের গোষ্ঠী আর্থিক জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, তাকে ভয় পেতে হয় দেশের দারিদ্র্যকে। অর্থাৎ পরিষেবার ক্রেতা বা গ্রহীতার ক্রয়ক্ষমতার সংকটকে তথা ভয়াবহ বাজার সংকটকে। পুঁজি খাটবে কোথায়? এই পুঁজির তাই প্রধান ব্যবসা সুদখোরি কারবার ও পুঁজি রপ্তানি। শিল্প সংকট ও কৃষির সংকট আজ মিলেমিশে জট পাকিয়ে গেছে। মন্দায় জর্জরিত দুনিয়ায় রপ্তানিমুখী বাণিজ্যভিত্তিক নয়া আর্থিক নীতির ভিত্তি ধসে পড়েছে। উৎপাদন শিল্পে অগ্রগতি প্রায় শূন্য। টাকার দাম তলানিতে নেমে সর্বকালীন রেকর্ড করেছে। হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ। লাখ লাখ শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। বেকার বাড়ছে বছরে ১০ শতাংশ হারে। বিশ্ব জোড়া মন্দায় সমস্ত পুঁজির মালিক-সরকার-রাষ্ট্র আজ আতঙ্কগ্রস্ত। চোখের পর্দা না রেখে শিল্পপতি গোষ্ঠীগুলোকে সেবা করা, বর্তমান সংকটগ্রস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা ব্যাঙ্ক শিল্পের প্রধান কাজ। পরিষেবার সেবামূলক ভূমিকার ভেকধারণ করতে হয় নিতান্তই প্রতারণার উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে সীমিত উচ্চ ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত

চারের পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্রে সেভ এডুকেশন কমিটির সভা

মহারাষ্ট্রের ইয়তমাল শহরে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে ৩১ আগস্ট শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতীদের এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবাশিস রায় কেন্দ্রীয় সরকারের তথাকথিত 'শিক্ষার অধিকার আইন'-এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করে দেখান, কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে সাধারণ স্কুলগুলিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে স্কুল স্তরে শিক্ষার পরিবেশকেই নষ্ট করে দিতে চাইছে। অপরদিকে শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব ক্রমাগত অস্বীকার করার দ্বারা শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করে ব্যবসায়ীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ সম্পূর্ণ করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে 'সেভ এডুকেশন আন্দোলন' গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক ও ছাত্র যুবকদের কাছে তিনি আহ্বান জানান। সভায় ১৬ জন শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতীকে নিয়ে 'ইয়তমাল জেলা সেভ এডুকেশন কমিটি' পুনর্গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্র খারাবে ও সম্পাদক হন শিক্ষক নীতেশ তায়ড়ে। সভা পরিচালনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা প্রমোদ কাম্বলে।

তমলুক শ্রমদপ্তরে হোসিয়ারি শ্রমিকদের বিক্ষোভ

হোসিয়ারি শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি, পুজোর আগে ২০ শতাংশ বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই, পরিচয়পত্র প্রদান সহ বিভিন্ন দাবিতে ৯ সেপ্টেম্বর এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির আহ্বানে তিন শতাধিক হোসিয়ারি শ্রমিক তমলুক এ এল সি অফিসে বিক্ষোভ দেখান। প্রায় ২ ঘন্টা বিক্ষোভ চলার পর মহকুমা শ্রম আধিকারিক স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন ইউনিয়নের জেলা সভাপতি কমরেড মধুসূদন বেরা, জেলা সম্পাদক কমরেড নেপাল বাগ, অভিজিৎ মাইতি, রমেশ পাখিরা, অসিত সামন্ত, প্রভাস পড়িয়া প্রমুখ। এ এল সি যত দ্রুত সম্ভব হোসিয়ারি শিল্পের সাথে যুক্ত মেকার মালিক ও ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা ডেকে শ্রম আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। ঐ দিন জেলার ডেপুটি লেবার কমিশনারও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে প্রতিনিধিদের জানান।

সোনারপুর নারী নিগ্রহ বিরোধী কনভেনশন

৮ সেপ্টেম্বর সোনারপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কনভেনশন। শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী সহ নানা পেশার দেড় শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সমাজে যেভাবে নারী নির্যাতন বাড়ছে, তাতে এই ধরনের প্রতিবাদী উদ্যোগের প্রয়োজন আজ খুবই। বক্তব্য রাখেন সঙ্গীতশিল্পী রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডঃ সুমিত সরকার, অধ্যাপক চৈতালি দত্ত, অধ্যাপক তরুণ দাস, আইনজীবী তরুণ হালদার প্রমুখ।

প্রত্যেকের বক্তব্যেই উঠে আসে গভীর উদ্বেগ, কোথায় নিরাপত্তা ঘরের মেয়েদের? শুধু উদ্বেগ প্রকাশ করেই তো এর থেকে নিষ্কৃতি নেই। তাই নাগরিকরা গড়ে তুললেন নারী নিগ্রহ বিরোধী আঞ্চলিক কমিটি। শিক্ষক রণজিৎ কুমার মণ্ডলকে সভাপতি, শুক্লা হালদার দাসকে সম্পাদক, নীতীশ কুমার মণ্ডলকে সহসম্পাদক এবং সবিতা বিশ্বাসকে কোষাধ্যক্ষ করে নতুন কমিটি গঠিত হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুরে যুব বিক্ষোভ

সকল বেকারের কাজ, কাজ না দেওয়া পর্যন্ত বেকার ভাতা, চিটফান্ডে সর্বস্বান্ত আমানতকারীদের টাকা ফেরত, মদ-জুয়া-সাট্টা-অশ্লীল বিজ্ঞাপন-মাদক দ্রব্যের প্রসার রোধ এবং ক্রমবর্ধমান নারী নিগ্রহের প্রতিবাদে যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৩ সেপ্টেম্বর জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। এই কর্মসূচিতে দেড় শতাধিক যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন।

সরকারি ডাক্তারদের ডেপুটেশন

সরকারি ডাক্তারদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর বদলি দীর্ঘদিন বন্ধ। মুষ্টিমেয় কিছু ডাক্তারের বদলি হচ্ছে, সেখানে চলছে দলবাজি, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ। বিভিন্ন হাসপাতালে চলছে ডাক্তার নিগ্রহ। এছাড়া প্রমোশন লিস্ট প্রকাশ করা, অ্যাডহক ডাক্তারদের স্থায়ীকরণ প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্যভবনে স্বাস্থ্য অধিকর্তার (ডি এইচ এস) কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস।

হরিহরপাড়ায় মহিলা নিগ্রহের প্রতিবাদে এম এস এস-এর বিক্ষোভ

মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার চোঁয়া গ্রামের পূর্বপাড়ায় ৯ সেপ্টেম্বর মধ্য রাতে এক দরিদ্র মহিলার উপর পাশবিক নির্যাতন চালায় কয়েকজন দুষ্কৃতী। দুই শিশুপুত্র সহ ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় টালি খুলে ঘরে প্রবেশ করে তারা ঐ মহিলাকে ধর্ষণ করে। ঐ দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে ১১ সেপ্টেম্বর এ আই এম এস এস দুই শতাধিক স্থানীয় মানুষকে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে থানায় ডেপুটেশন দেয়। পরদিন এলাকার মানুষ মুখে কালো কাপড় বেঁধে ধিক্কার মিছিল করেন। নারী নির্যাতন বিরোধী নাগরিক কমিটির নেতৃত্বে ১৪ সেপ্টেম্বর কয়েক শত মানুষ মিছিল করে হরিহরপাড়া থানায় বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনাচক্রে পুলিশ সুপার উপস্থিত থাকায় ও সি তড়িঘড়ি নির্যাতিতা মহিলাকে ডেকে পাঠান। তাঁকে বলেন, দুষ্কৃতীরা চুরি করতে ঢুকেছিল, সম্ভ্রমহানি করতে নয়। তাঁকে অভিযোগ তুলে নিতে চাপ দেওয়া হয়। প্রতিবাদে ধিক্কারে ফেটে পড়েন সাধারণ মানুষ। দুষ্কৃতীদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলন চলবে বলে জানান এম এস এসের জেলা সম্পাদিকা কমরেড পূর্ণিমা কর্মকার।

'হকার বিল' ঃ সংসদে ডাঃ তরুণ মণ্ডল

কেন্দ্রীয় সরকারের 'হকার বিল' সম্পর্কে গত ৬ সেপ্টেম্বর লোকসভায় এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, বিলটি শুনতে ভালো, কিন্তু এর ইতিবাচক দিকগুলি যেন সঠিকভাবে দ্রুত কার্যকরী হয় তা সরকারকে দেখতে হবে। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের অভাবে যে গরিব মানুষরা শহরে এসে হকারি করছেন, তাঁদের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। এঁদের জীবিকার্জনের অধিকারের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে শহরে থাকা-খাওয়ার সুলভ ব্যবস্থা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুর্ঘটনাগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা দরকার। দলমত নির্বিশেষে সকল হকারের লাইসেন্স এবং পুলিশ-প্রশাসন-সরকারি দলের নেতা-মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, তোলাবাজি বন্ধ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন সিপিএম সরকারের 'অপারেশন সানশাইন'-এর মতো বিভিন্ন রাজ্যে অমানবিক হকার উচ্ছেদের হাত থেকে এঁদের রক্ষা করে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকারকে সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের অবস্থান

অবিলম্বে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন সংশোধন, ব্যাঙ্কের কাজে আউটসোর্সিং বন্ধ, ব্যাঙ্কে চাকরির ক্ষেত্রে কন্ট্র্যাক্ট প্রথার অবসান, সমস্ত কন্ট্র্যাক্ট কর্মী, ক্যাজুয়াল কর্মী, ক্যান্টিন কর্মী, ক্যাজুয়াল ড্রাইভারদের স্থায়ী পদে নিয়োগ, পেনশন ও ফ্যামিলি পেনশন আপগ্রেডেশনের দাবিতে ১০ সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের আহ্বানে কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সামনে সারাদিন ব্যাপী অবস্থান করেন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক, আই ডি বি আই ব্যাঙ্কের স্থায়ী এবং অস্থায়ী কর্মচারীরা ব্যাপক সংখ্যায় এই অবস্থানে অংশগ্রহণ করেন।

অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেডস জগন্নাথ রায়মণ্ডল, বঙ্কিম বেরা, গৌরীশঙ্কর দাস, আলোকতীর্থ মণ্ডল, বসন্ত রায়, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ। তিনি বলেন, ব্যাঙ্ক শিল্পে কন্ট্র্যাক্ট কর্মীরা সঠিক বেতন পান না, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। এদের স্থায়ীকরণের দাবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দাবি আদায়ের জন্য ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামকেই লড়তে হবে। কারণ ব্যাঙ্ক শিল্পে অন্যান্য সমস্ত ইউনিয়নই কন্ট্র্যাক্ট প্রথার সমর্থনে সই করেছে, তা মেনে নিয়েছে।

কমরেড রায়মণ্ডল বলেন, বর্তমানে ব্যাঙ্ককর্মীরা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের থেকেও বেতন কম পান। কারণ ব্যাঙ্ক শিল্পে এ আই বি ই এ, বি ই এফ আই, এন সি বি ই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্যাকেজ ডিল করার ফলে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা তাদের প্রকৃত বেতন পান না। প্রতিটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতেই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করার জন্য ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাছে আহ্বান জানান।

মহাজন-ব্যাঙ্ক-দুষ্কৃতীচক্রের থাবা বিস্তার

তিনের পাতার পর

গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ নিংড়ে নেওয়ার কাজে এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তৃণমূল স্তরে মাইক্রোফিনান্সের মধ্য দিয়ে কার্যকর হচ্ছে। এ সব করতে গিয়ে ব্যাঙ্ক শিল্পকে কৃত্রিমভাবে অর্থের যোগান দিয়ে বর্ধিত আয়-ক্ষমতার একাংশকে দিয়ে একটা বাজার রক্ষা করতেই হয়। নইলে অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। তাই গাড়ির লোন, বাড়ির লোন, উচ্চশিক্ষার লোনের কেরামতি, চলছে পর্যটন লোন, এমনকী বিবাহ বার্ষিকীর লোন। এসেছে সেল্ফ হেল্প গ্রুপ। ফলে কানে জল ঢুকিয়ে জল বের করবার কায়দার মতন ব্যাপার। সুতরাং যে দেশের ৭০ শতাংশ মানুষের দৈনিক খরচ করার ক্ষমতা ২০ টাকার বেশি নয়, যাদের অন্ন যোগাতে হয় সরকারি ভিক্ষায়, বছরে আড়াই কোটি লোক যেখানে মাইগ্রান্ট লেবার হয়ে গ্রাম ছাড়ে, সেখানে ব্যাঙ্ক শিল্প কোন গরিবকে বাঁচাবে? গরিবরা উপদ্রব মাত্র!

অথচ সমস্ত ব্যাঙ্কের যাবতীয় পুঁজির যোগান প্রকৃত অর্থে আসে সাধারণ জনতার মুষ্টি ভিক্ষা থেকে। অর্থনীতিতে বলা হয় প্রতিটি আমানতকারীর কাছে ব্যাঙ্ক ঋণী হয়ে থাকে। কিন্তু কোনও ব্যাঙ্কনীতিই তার সপক্ষে নেই। নেই কোনও সরকারও। এই পুঁজি মূলত সেবা করে পুঁজিওয়ালাদেরই। কিছু উচ্ছিষ্ট পায় আমানতকারীরা। এই অবস্থায় কথার মারপ্যাঁচে গ্রামীণ মানুষকে সুদখোর মহাজনদের সঙ্গে ব্যাঙ্ক ও দুষ্কৃতী চক্রের এক মহাজোটের সামনে শিকার হিসাবে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষের অভাবের সময়ে ত্রাতা হিসাবে ব্যাঙ্ক শিল্প সম্পর্কে মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মিথ্যা আর মোহ সৃষ্টি এই দুই-ই তো হাতিয়ার আজ পুঁজিপতিদের।

প্রকাশিত হচ্ছে

কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় দেশব্যাপী গণআন্দোলন চাই

(৫ আগস্ট '১৩ পলিটব্যুরো সদস্যদের ভাষণ)

গণদাবী বিশেষ সংখ্যা

গণদাবীতে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধের সংকলন ছাড়াও থাকবে কমরেড প্রভাস ঘোষের (৫ আগস্ট '১২) ও কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের ভাষণ (২৪ এপ্রিল '১৩)

সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ

চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে পাওয়া যাবে

যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছু, ... এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে

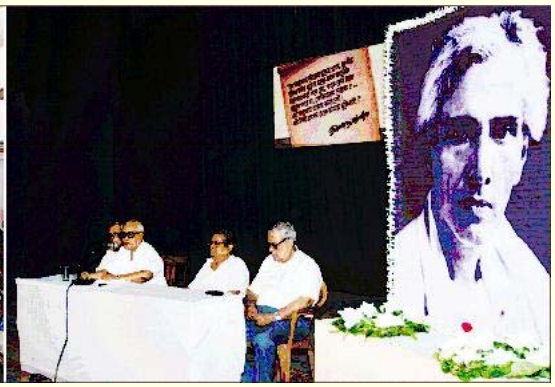

কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মীদের কেন শরৎ সাহিত্য চর্চা করতেই হবে — এই বিষয় নিয়েই এবার ১৭ সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনে আলোচনার আয়োজন করেছিল এম এস এস, ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, কমসোমল ও পথিকৃৎ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক। মূল আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর ও কমরেড মানিক মুখার্জী। ছাত্র-যুব-মহিলাদের উপস্থিতিতে মহাজাতি সদন ছিল পূর্ণ।

খাদ্য সুরক্ষা বিল প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়

এস ইউ সি আই (সি)

২৭ আগস্ট এক বিবৃতিতে এস ইউ সি আই (সি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, গতকাল ২৬ আগস্ট সংসদে চূড়ান্ত দ্রুততার সঙ্গে, কার্যত গিলোটিন মোশনের দ্বারা জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিল পাশ করানো হয়েছে। নানা চমক, রঙীন প্রতিশ্রুতি এবং সুলভে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য জনগণের হাতে তুলে দিয়ে তাদের খাদ্য ও পুষ্টিগত সুরক্ষা দেওয়ার মতো বহু কথা এতে বলা হয়েছে, যা বাস্তবে প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। প্রথমে টিডিপি ও পরে বিজেপি নিজেদের তোলা দাবিগুলি নিয়ে সংসদের বাইরে আন্দোলন গড়ে তোলার পথে না গিয়ে শুধুমাত্র প্রচার পাওয়ার জন্য হৈচৈ বাধিয়ে সংসদে কাজ চলতে দিল না, ফলে অনাহারগ্রস্ত দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষ সহ লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কোনও অর্থবহ আলোচনাই হতে পারল না।

দেখা যাচ্ছে, একটি দুর্নীতিমুক্ত বন্টন পদ্ধতির মাধ্যমে সুলভে গুণমানসম্পন্ন খাদ্যশস্য উপযুক্ত পরিমাণে দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে হলে তার প্রাক শর্তগুলির মতো অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এই বিলে আলোচনা করা হয়নি। প্রথমত, এই বিলটি অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী রচিত বলে যে দাবি করা হয়েছে, তা ঠিক নয়। কারণ, 'খাদ্যের অধিকার' সাংবিধানিক বা আদালতগ্রাহ্য অধিকার হিসাবে স্বীকৃত নয়। দ্বিতীয়ত, খাদ্যের মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ খুবই সামান্য। হালকা থেকে সাধারণ পরিশ্রম করা মানুষের ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার জন্য প্রতি মাসে যেখানে মাথাপিছু ন্যূনতম ১৫ কেজি খাদ্য প্রয়োজন, সেখানে প্রস্তাবিত মাসিক মাথাপিছু ৫ কেজি খাদ্যশস্য নিতান্তই কম। নগণ্য বরাদ্দের গুরুতর দিকটি ব্যাপক ঢক্কানিনাদের নিচে সুকৌশলে চাপা দেওয়া হয়েছে। কারণ, কংগ্রেস পরিচালিত শাসক ইউ পি এ-র লক্ষ মানুষকে খাদ্য দেওয়া নয়, আগামী নির্বাচনের জন্য নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা। তৃতীয়ত, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ভারতবাসী, বিশেষত দারিদ্রসীমার নিচে বাস করা বিরাট সংখ্যক মানুষ তীব্র অপুষ্টির শিকার হয়ে নীরব যন্ত্রণায় অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর সমস্যার বিষয়ে এই বিলে কোনও নজর দেওয়া হয়নি। চতুর্থত, এই বিলে প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম যেটুকু খাদ্য বরাদ্দের বিধান দেওয়া হয়েছে, সেটুকুও নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়নি।

তদুপরি, খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বন্টনের পদ্ধতিটির বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধতা করার বদলে বরং আরও বেশি করে তা বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার ইঙ্গিতই রয়েছে এই বিলটিতে। গণবন্টনের চলতি যে ব্যবস্থাটিকে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন-পুলিশ-অসাধু ব্যবসায়ী-মজুতদার-কালোবাজারি-শাসক দলের দুষ্টচক্র করায়ত্ত করে বাস্তবে অকার্যকরী করে রেখেছে, কীভাবে তা থেকে গণবন্টন ব্যবস্থাকে মুক্ত করা যাবে, সে বিষয়েও এই বিলে কিছু বলা হয়নি। এমনকী 'আধার' প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের হাতে সরাসরি অর্থ পৌঁছে দেওয়ার যে ব্যবস্থাটির বহুল প্রচার চলছে, তা যেমন একদিকে তৈরি থাকা কোনও ব্যবস্থা নয়, অন্যদিকে ঐ ব্যবস্থায় অসাধু দালালদের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা সহ নানা দুর্বলতা রয়েছে, ফলে এই ব্যবস্থাটিরও প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্তর্ঘাত, কারচুপি সহ নানা দুর্নীতির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। সুতরাং এই বিল, সরকার যেভাবে দাবি করছে, সেভাবে 'মর্যাদা নিয়ে বাঁচা'র ব্যবস্থা করার পরিবর্তে জনগণকে করুণা ও দান-খয়রাতের ওপর নির্ভরশীল চরম অমর্যাদাকর জীবনের দিকেই ঠেলে দেবে। উপযুক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী হয়ে জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে এরা গিয়ে পড়বে দালালদের খপ্পরে এবং তাদের কৃপাধন্য হয়েই তাদের বাঁচতে হবে। বস্তুত, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অধিকারকেও এই 'খাদ্য সুরক্ষার' বাগাড়ম্বরের আড়ালে চাপা দেওয়া হচ্ছে। ফলে গোটা বিষয়টিই ভোটের লক্ষ্যে জনগণকে প্রতারিত করার অপকৌশল ছাড়া কিছু নয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত স্থায়ী উপার্জনের উপায় হিসাবে জনগণের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা, যাতে তারা প্রয়োজনীয় ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সুস্থ স্বাস্থ্যকর জীবন কাটাতে পারে এবং তাদের এই ধরনের দান-খয়রাতের ওপর আদৌ নির্ভর করতে না হয়। অন্যদিকে প্রয়োজন হচ্ছে, জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করে দুর্নীতি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাবমুক্ত বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুলভে উপযুক্ত মানের খাদ্যসামগ্রী প্রতিটি নাগরিকের জন্য সরবরাহ করা। এক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই দেশের সমস্ত নাগরিককে খাদ্য সরবরাহের সার্বিক দায়িত্ব নিতে হবে।

আমরা দাবি করছি বর্তমান বিলটি প্রত্যাহার করা হোক এবং সমস্ত ছলচাতুরি ও খামতি মুক্ত করে এবং বাদ পড়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ও সমস্ত ন্যায্য দাবি যুক্ত করে কার্যকরী বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে উপযুক্ত পরিমাণ উচ্চমানের খাদ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নতুন বিল আনা হোক।

অবহেলায় নষ্ট ১৭ হাজার টন খাদ্য ৭ কোটি মানুষের খিদে মেটাতে পারত

'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন
বেলা বয়ে যায় খায়নিকো বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।'

ব্রিটিশ আমলে এই কথাগুলি বলেছিলেন নজরুল। দেশ স্বাধীন হয়েছে ৬৬ বছর। আজও কচি পেটে আগুন জ্বলছে।

২৭ আগস্ট বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে সংসদে পাশ হয়েছে খাদ্য সুরক্ষা বিল। তাতে দেশজুড়ে ঘটে চলা অপুষ্টি, ক্ষুধা, অনাহার, পরিণতিতে মৃত্যু এই অভিশপ্ত শব্দগুলি দেশ থেকে উধাও হয়ে যাবে এমন কল্পনা বহু মানুষের মনে উঁকি দিয়েছে। দেশের ৬৭ শতাংশ মানুষকে ভর্তুকি সহ খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার অঙ্গীকারও করা হয়েছে বিলটিতে। কিন্তু সংশয় দেখা দিয়েছে অন্যত্র। এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে খাদ্য সুরক্ষা দিতে গেলে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে তো! প্রশ্ন উঠেছে যারা খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারে না, তারা খাদ্য সুরক্ষা দেবে কী করে? সরকারি পরিসংখ্যানে প্রকাশ, গত তিন বছরে গুদামের অভাবে ১৭ হাজার টন খাদ্যশস্য নষ্ট হয়েছে। যা দিয়ে অন্তত ৭ কোটি মানুষের খিদে মেটানো যেত।

দেশের ৬৭ শতাংশ মানুষের জন্য কী পরিমাণ খাদ্য দরকার? বিশ্ব খাদ্য সংস্থার মাপকাঠিতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দৈনিক কমপক্ষে ২৫০ গ্রাম খাদ্য প্রয়োজন। সেই হিসেবে খাদ্য সুরক্ষার জন্য ৬ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য চাই। তা স্বাস্থ্যকর উপায়ে গুদামজাত ও মজুত করা দরকার। কিন্তু সেই পরিকাঠামো নেই সরকারের। ফলে নষ্ট হচ্ছে ধান, চাল, গম, জোয়ার, বাজরা সহ সমস্ত খাদ্যশস্যই। ঠিকভাবে মজুত না করায় সব থেকে বেশি চাল নষ্ট হয়েছে খোদ পশ্চিমবঙ্গে। ২০০৯-১০ এবং ২০১১-১২ মিলিয়ে মোট ২৩০০ টন।

এত খাদ্যশস্য পচেই নষ্ট হচ্ছে, অথচ তা কোনওভাবেই পৌঁছচ্ছে না দেশের অর্ধভুক্ত, নিরন্ন মানুষগুলির কাছে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী কে ভি টমাস আত্মতুষ্টির সাথে বলেছেন, 'কিছু খাদ্যশস্য নষ্ট হলেও তার পরিমাণ অনেকটাই কম। তিনি নিজেদের ঢাক পিটিয়ে বলেছেন, পাঁচ বছর আগে মাত্র ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করত সরকার। এখন সেই জায়গায় ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে মজুত করার বন্দোবস্ত চলছে।' অর্থাৎ তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহের রেকর্ড ভালোই!

যদিও কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ারকে স্বীকার করতে হয়েছে, মজুতের পরিকাঠামোর অভাবে প্রতি বছর যে পরিমাণ খাদ্যশস্য, ফল ও শাকসব্জি নষ্ট হয়, তার মূল্য প্রায় ৪৪ হাজার কোটি টাকা। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ গরিবের দেশ ভারতে যেখানে কোটি কোটি মানুষ পেটভরে খেতে পায় না, সেখানে মন্ত্রীদের আত্মসন্তুষ্ট হতে দেখে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এরা কি দিতে পারে মানুষের খাদ্য সুরক্ষা? হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য নষ্ট হচ্ছে, আর তা মজুত করার উদ্যোগ না নিয়ে সরকার এমন সমৃদ্ধির ঢাক পেটাচ্ছে, যেন শুধু আইন পাশের অপেক্ষা— তা হলেই মানুষ রাতারাতি খাদ্য সুরক্ষার বর্মে আচ্ছাদিত হয়ে খিদেটা পর্যন্ত গিলে ফেলতে পারবে!

আসলে ২০১৪-এর নির্বাচনে গদি সুরক্ষিত রাখতে কংগ্রেসকে খাদ্য সুরক্ষার বর্ম পরতে হয়েছে। অন্য দলগুলিও নিজেদের জনদরদি প্রমাণ করতে এই বিলকে একবাক্যে হৈ হৈ করে সমর্থন জানিয়েছে বিলের বহু জনবিরোধী দিক নিয়ে কার্যত কোনও প্রশ্ন না তুলেই। এমনকী সিপিএমও বিলের উপর কোনও সংশোধনী আনেনি। ক্ষমতালিপ্সু দলগুলি প্রশ্ন তোলেনি কেন একজন মানুষের ২০০০ ক্যালোরি খাদ্যের ন্যূনতম প্রয়োজন না মিটিয়ে সুরক্ষার নামে ৬৬৪ ক্যালোরি খাদ্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে? প্রশ্ন তুললে যদি ভোটব্যাঙ্কে টান পড়ে, সেইজন্য কি? এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেছেন, এই বিল প্রতারণামূলক। স্বাধীনতার ৬৬ বছর পরে ভরপেট খাদ্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংসদে বিল আনতে হচ্ছে কেন? সরকারগুলি এতদিন করেছে কী? কেনই বা ন্যূনতম খাদ্যটুকু গরিব মানুষের মুখে তুলে দেওয়া হচ্ছে না? এটা কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলির নির্বাচনী গিমিক ছাড়া আর কী?

ফলে এই খাদ্য সুরক্ষা বিলের দ্বারা কোনও সুরাহাই হবে না। সরকার খাদ্যশস্য যথাযথভাবে সংরক্ষণও করবে না। করবে শুধু মানুষের ক্ষুধা নিয়ে হৃদয়হীন রাজনীতি।

সর্বপ্রথম আমি ইরানের তুদে পার্টিকে অভিনন্দন জানাই ও তাদের সংগ্রামের সাফল্য কামনা করি। মিশরের এই বিরাট ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তুলে ধরার সুযোগ আমাকে দেওয়ার জন্য 'নামেহ মারডম' সংবাদপত্রকে আমার সেলাম জানাচ্ছি।

প্রশ্ন ঃ কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইজিপ্ট-এর সাম্প্রতিক একটি বিবৃতিতে (৩ জুলাই) আপনি বলেছেন, এই বিরাট মাপের গণঅভ্যুত্থানে বহু শ্রেণি ও নানা স্তরের মানুষ আছেন। ৩০ জুন বিপ্লবের এই দ্বিতীয় তরঙ্গে মিশরীয় সমাজের এত শ্রেণি এত নানা স্তরের মানুষ সমবেত হলেন কীভাবে, যদি একটু বলেন।

সালেহ আদলে ঃ ২৫ জানুয়ারি ২০১১ থেকে আজ অবধি প্রতিবাদ আন্দোলনের তো খামতি নেই, লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল বন্ধ হয়নি। জনসাধারণের বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই জাগ্রত ছিল, কখনও তা স্তিমিত ছিল, কখনও জ্বলে উঠেছে।

শ্রমিকদের প্রতিবাদ আন্দোলন, ধর্মঘট ক্রমশ বাড়ছিল। ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর মুরসি ও মুসলিম ব্রাদারহুডের আধিপত্যবাদী, ফ্যাসিস্ট চরিত্র জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা দেখেন, মুরসি ও মুসলিম ব্রাদারহুড মিশরের প্রতিক্রিয়াশীল ও পুঁজিপতিদের পরজীবী অংশের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী। মিশরের মতো বিশাল একটা রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা অযোগ্য।

সর্বোপরি দেশের স্বার্থের প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, এতদঞ্চলে মার্কিন ও ইজরায়েলের স্বার্থরক্ষায় তাদের দালালসুলভ আগ্রহ মানুষের চোখে ধরা পড়ে যায়। এমনকী মোবারকের দালাল সরকার যা দেয়নি, গাজা চুক্তি বাতিল করার মধ্য দিয়ে তারা আমেরিকা ও ইজরায়েলকে তাও দিয়ে দেয়। তাদের সংকীর্ণ ও তমসাচ্ছন্ন কর্মসূচি যে গণতন্ত্র, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সহনশীলতার পরিপন্থী, এটাও পরিষ্কার হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা হল, তাদের মুখে ধর্মীয় স্লোগানগুলো যে তাদের 'বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য' প্রকল্প ও ' সৃষ্টিশীল বিশৃঙ্খলা' ('ক্রিয়েটিভ ক্যাওস') নামক পরিকল্পনাকে আড়াল করার জন্য মিথ্যাচার, তা জনগণের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছে।

মহম্মদ মুরসি নিজেই স্বীকার করেছেন, গত বছরেই সামাজিক প্রতিবাদের সংখ্যা (অবস্থান, মিছিল ও প্রতিবাদী পিকেট) ৭৪০০-তে পৌঁছেছে। ৩২ শতাংশ বেকার, বেশিরভাগ বেকারই উচ্চ অথবা মাঝারি শিক্ষার অধিকারী। বিদেশি ঋণ ৩৪০০কোটি ডলার থেকে বেড়ে ৪৫০০ কোটি ডলার হয়েছে। মুরসির শাসনের শেষ বছরে আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৬৫০০কোটি মিশরীয় পাউন্ড। দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫০ শতাংশের বেশি।

এক কথায়, প্রধান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষত সেনাবাহিনী, বিচার ব্যবস্থা, গণমাধ্যম ও পুলিশ ছাড়াও সমাজের অধিকাংশ শ্রেণি, নানা স্তরের মানুষ এবং উদারনৈতিক, জাতীয়তাবাদী, বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলি ও তার সাথে যুবসমাজ, যারা মুখ্যত বামপন্থা ও জাতীয়তাবাদমুখী, তারা বুঝেছে যে ক্ষমতায় মুসলিম ব্রাদারহুড থাকার ফলে গভীর বিপদ দেখা দিচ্ছে। কারণ মুসলিম ব্রাদারহুড ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে মরিয়া, ধর্মের পর্দার আড়াল নিয়ে চলা সন্ত্রাসবাদীদের ছাড়া তারা আর কাউকে সাথে নিতে রাজি নয়, শাসকদের যারাই সমর্থন করে না, তাদেরই তারা বাদ দেয়।

ক্ষমতায় বসে মুসলিম ব্রাদারহুড যেরকম বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তার অভাব ও অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে তাতে তাদের শাসন দীর্ঘায়িত হলে, পর্যটন, কলকারখানা, ব্যবসা, কৃষি ও নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগকারী মিশরের বড় ও মাঝারি বুর্জোয়ারা তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে মনে করে আতঙ্কিত বোধ করছে।

তামারুদ (বিদ্রোহ) আন্দোলন মুরসির প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে দ্রুত নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দাবিতে ২ কোটি ২০ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে সফল হয়েছে। সমস্ত দল, ট্রেড ইউনিয়ন, নানা সংগঠন স্বাক্ষর সংগ্রহে অংশগ্রহণ করেছে। শহরের রাস্তাঘাট, স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রামগঞ্জ, সরকারি দপ্তর সর্বত্র প্রচারাভিযান চলেছে। এই আন্দোলনের বড় সাফল্য হল, এই আন্দোলন মুসলিম ব্রাদারহুডের শাসনের অবসান ঘটাতে বিপ্লবী আন্দোলনে জনতাকে সক্রিয় করেছে।

এই আন্দোলন বিপ্লবী সক্রিয়তার গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ চরিত্রকে ফিরিয়ে এনেছে। এবং ব্যালট বাক্সই ন্যায্যতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি — এই মর্মে ব্যালট বাক্সর উপর মিথ্যা ন্যায্যতার যে 'পবিত্র মুখোশ' লাগানো হয়েছে, তা খুলে ফেলার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টির অনুকূলে কাজ করেছে এই আন্দোলন। স্বাক্ষর সংগ্রহের এই অভিযানের সাথে সাথে ৩০ জুন মিশরের প্রধান চকে জমায়েতের আহ্বান রাখা হয়েছিল, যার লক্ষ ছিল, যে ফ্যাসিবাদী শাসন ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগোচ্ছে, গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তাকে উৎখাত করার বিপ্লবী ন্যায্যতা প্রমাণ করা।

মিশর পরিস্থিতি

মিশর কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের সাক্ষাৎকার

[ইরানের তুদে (কমিউনিস্ট) পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'নামেহ মারডম'-এ সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় ১৬ জুলাই, ২০১৩]

এই আহ্বানে মিশরের জনসাধারণের সাড়া ছিল অভূতপূর্ব। মিশরের ইতিহাসে এমনকী বিশ্বের ইতিহাসে সেদিনের মিছিল ছিল বৃহত্তম। এই তথ্য 'গুগুল আর্থ' ইনডেক্স দ্বারা প্রমাণিত। মিশরের সকল প্রদেশে সেদিন একই সময়ে ২ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি মানুষ মিছিলে অংশ নিয়েছিল। যার মধ্যে সমাজের নানা শ্রেণি ও নানান স্তরের প্রতিনিধিরা ছিলেন। জবাবে মুসলিম ব্রাদারহুড ও তার মিত্ররা যে জমায়েত করেছিল কায়রোর অপেক্ষাকৃত ছোট মাঠে, তাতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২ লক্ষ ছাড়ায়নি। এই হল বাস্তব অবস্থা, যার ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে হবে।

আমরা মনে করি, মিশরের বিপ্লবে ৩০ জুনের দ্বিতীয় তরঙ্গের তীব্রতা ছিল ২০১১ সালের প্রথম তরঙ্গের চেয়েও গভীর এবং অধিক শক্তিশালী। এই অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল মিশরের বিপ্লবকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা এবং গণঅভ্যুত্থানের সুযোগে যেসব চরম ধর্মবাদী

একটা বিষয় পরিষ্কারভাবে বলা দরকার যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারীরা দেখেছে যে, কাজকর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে মুবারক জমানার কোনও তফাৎ নেই। বরং এরা আরও খারাপ। অতীতের ধারাবাহিকতায় মুসলিম ব্রাদারহুডও বেসরকারিকরণ, বাজারনির্ভর দাম নির্ধারণের নীতি বজায় রেখেছে ও বিপ্লবের শীর্ষ দাবি হওয়া সত্ত্বেও ন্যূনতম মজুরি বাড়াবার পথে হাঁটেনি।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ফ্যাসিবাদের পথে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল লক্ষ্য ও বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনাকে সফল করতে চাইছিল, তাদের হাত থেকে বিপ্লবের লাগাম কেড়ে নেওয়া।

প্রশ্ন ঃ এই প্রতিবাদে মেহনতি মানুষ ও শ্রমিকদের অংশগ্রহণ কেমন ছিল? কেন অংশগ্রহণকারী শ্রমিকরা গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে সংগ্রামে ইসলামবাদী রাজনীতিবিদদের সাথে যুক্তভাবে অংশ নিল?

সালেহ আদলে ঃ জানুয়ারি বিপ্লবের মূল স্লোগান ছিল, রুটি-স্বাধীনতা-সামাজিক ন্যায় ও মানুষের মর্যাদা চাই। গত শতকের সাতের দশকের মধ্যভাগ থেকে শুরু হওয়া ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতা ছিল এর মধ্যে।

এই সময়ই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও আরব প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে আঁতাত করে এমন একটা পরিবেশ তৈরিতে মদত দেয় যা ইসলামবাদী রাজনীতির বিশেষত মুসলিম ব্রাদারহুডের বিস্তার ও শক্তিবৃদ্ধির পথ করে দেয়। বামপন্থী শক্তিগুলি দুর্বল হয়, শ্রমিকদের নির্বিচারে ছাঁটাই করা হয়।

বস্তুত, ২০০৬ সাল থেকেই প্রতিবাদ আন্দোলন তীব্র হচ্ছিল এবং শ্রমিকরা তাতে অংশগ্রহণ করছিল। সংগঠিত শ্রেণি হিসাবে নয়, জনগণের অংশ হিসাবে তারা গণমিছিলে অংশ নিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি দমনপীড়ন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক সংগঠনের অভাবই এর কারণ।

এর আর একটা কারণ হল, ঐ সময়ে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের বিন্যাসের প্রকৃতিতে বদল ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণির চেহারায় একটা বড় রকম পরিবর্তন ঘটানো হয়। ব্যক্তিমালিকানাধীন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষেত্রের ওপর নির্ভরতা ছিল বেশি, সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে নানাভাবে বাধা দেওয়া হয়।

এই বিপ্লবে শ্রমিকরা শ্রেণি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। অতীতে নানা কারণে বামপন্থী শক্তিগুলির মধ্যে কার্যকর ঐক্য ছিল না, তারা দুর্বলও ছিল। এই অভাবের ফলে এই বিপ্লবে বিপুল আত্মত্যাগ ও অংশগ্রহণের সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিক আন্দোলন প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

একটা বিষয় পরিষ্কারভাবে বলা দরকার যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারীরা দেখেছে যে, কাজকর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে মুবারক জমানার কোনও তফাৎ নেই। বরং এরা আরও খারাপ। অতীতের ধারাবাহিকতায় মুসলিম ব্রাদারহুডও বেসরকারিকরণ, বাজারনির্ভর দাম নির্ধারণের নীতি বজায় রেখেছে ও বিপ্লবের শীর্ষ দাবি হওয়া সত্ত্বেও ন্যূনতম মজুরি বাড়াবার পথে হাঁটেনি।

তারা এমনকী ব্যবসায়ীদের ওপর কর কমিয়েছে, পরিষেবার বেসরকারিকরণ চালিয়ে গেছে এবং স্বাস্থ্যবিমা চালু করতে অস্বীকার করেছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের নিয়ন্ত্রণাধীন সুরা কাউন্সিলে (মিশরের সংসদের উচ্চকক্ষ) তড়িঘড়ি 'ইসলামিক বন্ড' প্রকল্প পাশ করিয়ে এই প্রকল্পের মাধ্যমে মিশরের সম্পদ ও নানা প্রতিষ্ঠান বিক্রি করা বা বন্ধক দেওয়ার পথে হেঁটেছে।

সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হল, সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি ও ট্রেড ইউনিয়নের কাছে শর্তবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তারা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা দিয়ে আইন করতে চায়নি। সরকার নিয়ন্ত্রিত জেনারেল ইউনিয়ন অফ ইজিপ্সিয়ান ওয়ার্কার্স থেকে মোবারকের লোকদের সরিয়ে নিজস্ব লোক দিয়ে তা ভর্তি করেছে। এই সামাজিক ও গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই শ্রমিক শ্রেণি বিপ্লবের পক্ষে এসেছে এবং মুসলিম ব্রাদারহুড ও ইসলামবাদী রাজনৈতিক শক্তিগুলির শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। পূর্বোল্লেখিত কারণগুলির সঙ্গে এটা যুক্ত হয়েছে।

কেউ যদি মনে করেন যে, শ্রমিকরা কেবল নিজেদের কিছু বিষয় বা অর্থনৈতিক কিছু কারণে বিদ্রোহ করেছে — তাহলে তিনি মস্ত ভুল করবেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও জাতীয় ক্ষেত্রে চরম ধর্মবাদী দক্ষিণপন্থী প্রকল্পের বিপদ ও দক্ষিণপন্থীদের ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কে শ্রমিকরা বরং বেশি সচেতন।

প্রশ্ন ঃ আপনার বিবৃতিতে বলেছেন, কমিউনিস্ট পার্টি অব ইজিপ্ট বর্তমান ঘটনাবলীকে বিপ্লব বলে চিহ্নিত করেছে। এই বিপ্লবের চরিত্র, কর্মসূচি ও আশু দাবিগুলি কী কী?

সালেহ আদলে ঃ হ্যাঁ, যা ঘটছে তা বিপ্লবই। সঠিকভাবে বললে ২০১১ সালের জানুয়ারি বিপ্লবের দ্বিতীয় তরঙ্গ। বিপ্লবের প্রথম তরঙ্গটি ব্যর্থ হয়েছে কারণ, বিপ্লবের আহ্বান না দিলেও এবং বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ না করা সত্ত্বেও মুসলিম ব্রাদারহুড ঐ বিপ্লবের নেতৃত্ব কব্জা করেছিল।

যা ঘটছে তার সুস্পষ্ট সামাজিক ও দেশপ্রেমিক চরিত্র থেকেই পরিষ্কার যে এটা গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লব চলছে, নানা স্তরের ব্যাপক মানুষ ও নানা রাজনৈতিক শক্তি (উদারনৈতিক, জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী) এতে অংশ নিচ্ছে। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের এই ধারায় নানা গোষ্ঠীর মানুষের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যাবে। এইসব শক্তিগুলির পক্ষপাতিত্ব কোনদিকে, বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়ার আগ্রহ কতটা, তা প্রকাশিত হবে।

প্রথম গণতান্ত্রিক কাজ হল, এমন একটি নতুন অসামরিক গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করা, যা মানবাধিকার, নারীর অধিকার, শ্রমজীবী মানুষের আর্থিক ও সামাজিক দাবিগুলির ওপর জোর দেয়। যে সংবিধান শক্তির ভারসাম্যের দিকে লক্ষ রেখে ভবিষ্যতে পছন্দমতো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের অধিকারকে বাতিল করবে না। সুতরাং সংকীর্ণ, প্রতিক্রিয়াশীল, ও বিকৃত সংবিধানের নিছক সংশোধন না করে তাকে বাতিল করাই বর্তমান সময়ে গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল শক্তির প্রধান কাজ।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম কাজ হল, সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল ও সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা দেওয়া। কোনও ধর্মীয় বা কোনও সংকীর্ণ ভিত্তির ওপর রাজনৈতিক দল গঠন করতে না দেওয়া, নারী-পুরুষের মধ্যে সমানাধিকার ও সমকর্তব্য প্রতিষ্ঠা করা। আইনের চোখে সবাই সমান এই নীতি চালু করা ও ধর্মের নামে অপরাধ ও অন্যান্য বৈষম্য বন্ধ করা।

সামাজিক কাজের মধ্যে আছে, উৎপাদনমূলক ক্ষেত্রের উন্নয়নের ফল দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের ভিত্তিতে সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের জরুরি দাবিগুলি পূরণের দিকে লক্ষ রেখে সামগ্রিক সমাজবিকাশের পরিকল্পনা রচনা করা।

এই সব দাবিগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মজুরি নির্ধারণের উপর। সকল ক্ষুদ্র চাষির ঋণ মকুব করতে হবে ও বাজেট-বরাদ্দের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য বাসস্থান ইত্যাদি খাতে বেশি বরাদ্দ করতে হবে। ধনীদের ওপর কর বাড়াতে হবে, একচেটিয়া

সাতের পাতায় দেখুন

‘মুবারক ও মুরসি’র শাসনের মধ্যে কোনও পার্থক্য পায়নি মানুষ’

ছয়ের পাতার পর

মালিকদের লুঠ করা সরকারি সম্পত্তি পুনর্দখল করতে এবং দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

জাতীয় স্তরে কাজ হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতার বিরুদ্ধতা করা, উগ্র ইহুদিবাদীদের আধিপত্যের কাছে মাথা নত না করা, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি সংশোধন করা, আরব আফ্রিকার আঞ্চলিক স্তরে ও আন্তর্জাতিক স্তরে মিশরের ভূমিকা ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনা এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ও জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করা।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান ঘটনাবলীর অর্থ কি ইসলামবাদী রাজনীতিকে বাতিল করা, নাকি শুধু মুসলিম ব্রাদারহুডকে খারিজ করা?

সালেহ আদলে ঃ যেসব রাজনৈতিক দল ইসলামকে নিয়ে চলে, তাদের মধ্যে মুসলিম ব্রাদারহুড অত্যন্ত প্রভাবশালী সংগঠন। সালাফি ও জেহাদপন্থী গোষ্ঠীগুলি সহ বাকি সব সংগঠন এদের মিত্রশক্তি। ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা ধরে রাখার শেষ লড়াইতে তারা সকলেই পথে নেমেছে। কারণ তারা জানে তাদের পরাজয় মানে হল, মোবারকের ধ্বংসোন্মুখ স্বৈরাচারী শাসনের বিকল্প রূপে যে সংকীর্ণতাবাদী ইসলামিক প্রকল্পকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মদত দিয়েছে, তার পরাজয়।

ক্ষমতা রক্ষার শেষ লড়াইতে যারা নেমেছিল, তাদের মধ্যে সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্কের ঝুরণে কেবলমাত্র সালাফি-আল-নুর বাদ ছিল। তবে তারা যে প্রতিক্রিয়াশীল ও সংকীর্ণতাবাদী দল, মানবাধিকার, নারীর সমানাধিকার ও অন্যান্য ইসলামিক গোষ্ঠী সহ সকল সংখ্যালঘুর অধিকারের বিরুদ্ধে, তা আমরা জানি। যখন তারা শিয়াদের হত্যা করার মতো অপরাধমূলক কাজের জন্য উত্তেজিত করে এবং গত মাসে একটা ভয়ঙ্কর গণহত্যায় নিহত শিয়াদের দেহ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় তখনই তাদের চরিত্র স্পষ্ট হয়ে গেছে।

আমাদের বিশ্বাস, সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। তাদের শেষ প্রতিরোধ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া, এবং গত কয়েক দশক ধরে সাধারণ মানুষ যে পরিবেশ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে, সেই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চালানোর দরকার আছে।

যে বিষয়টির প্রতি আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল, মিশরে যা ঘটছে তা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মুসলিম ব্রাদারহুড ও তার দক্ষিণপন্থী মিত্রদের সংঘর্ষ নয়।

বাস্তবে বিচার ব্যবস্থা, গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি সহ মিশরের সর্বস্তরের জনগণ, প্রবহমান ঘটনাবলী ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণপন্থীরা। বিগত দু’বছরে বিরাট অংশের মানুষের সমর্থন হারানোর ফলে শহরতলি ও গ্রামে মুসলিম ব্রাদারহুডকে মিশরের জনগণের বিরুদ্ধতার মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী মিলিশিয়া রয়েছে মুরসিদের, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তাবাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক কথায়, আমরা দেখছি, কেবল মুসলিম ব্রাদারহুডের পরিকল্পনাই নয়, সাধারণভাবে ধর্মবাদী দক্ষিণপন্থীদের পরিকল্পনাই ভালোরকম ধাক্কা খেয়েছে। এর বড় রকম প্রভাব পড়বে এই অঞ্চলে আগামী দিনে।

প্রশ্ন ঃ যাঁরা বলছেন মুরসি ছিলেন আইনত নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীকালে নতুন সংবিধান গণভোটের দ্বারা গৃহীত হয়, এই যুক্তিতে মুরসির অপসারণ অগণতান্ত্রিক, সে বিষয়ে আপনার মত কী? মুরসিকে কি মিশরের সেনাবাহিনীই উৎখাত করেছে?

সালেহ আদলে ঃ মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করার দলিলে স্বাক্ষর করেছে মিশরের ২ কোটি ২০ লক্ষ নাগরিক। ক্ষমতাচ্যুতির দাবিতে দলিলে সই করার সময় তাঁরা নিজ নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, এবং নিজের প্রদেশের নাম হাতে লিখে দিয়েছে, ইন্টারনেটে নয়। এই অসাধারণ গণভোট ৩০ জুন থেকে চারদিন ধরে মিশরের প্রধান চকে ২ কোটি ৭০ লক্ষ প্রতিবাদী মানুষের জমায়েত থেকে বেরিয়ে এসেছে। মুরসি নিজেই নভেম্বর ২০১১-তে সাংবিধানিক একনায়কত্বের ফতোয়া জারি করে ক্ষমতায় থাকার ন্যায্যতা হারান। মুরসির দোসর সন্ত্রাসবাদের সমর্থকরা যখন কনস্টিটিউশনাল কোর্ট ঘেরাও করে তখনই মুরসি মানবাধিকার ধ্বংস করেছেন।

পাবলিক প্রসিকিউটারের অফিসের তদন্তে প্রকাশ, মুরসির মিলিশিয়া আল-ইত্তাহাদিয়া প্রাসাদের (রাষ্ট্রপতি ভবন) সামনে প্রতিবাদীদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক শাখা ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টির সদর দপ্তরের সামনে মিছিলে সামিল জনগণকে খুন করেছে। পার্টির নেতা ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের নির্দেশেই যে খুন করা হয়েছে তা খুনির জবানবন্দিতে প্রকাশ পেয়েছে।

সংবিধান সংশোধনে সাফল্যের পর মুরসি যে কোয়ালিশন সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তা থেকে তিনি সরে গেছেন। তিনি ও তাঁর গোষ্ঠী আই এম এফ-এর শর্তের কাছে নতি স্বীকার করেছেন। সেনাবাহিনী ও জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদকে না জানিয়ে সন্ত্রাসবাদী জেহাদিদের এক সম্মেলনে তিনি সিরিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন।

তাই ভরাডুবির আগেই সালাফি আল-নুর সহ সমস্ত পার্টি ও শক্তিগুলি বেরিয়ে এসে আশু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দাবিকে সমর্থন করেছে। এই দাবি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান নয়, বরং জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকেই এর উদ্ভব। যখনই কোনও রাষ্ট্রপতি জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি, যার ভিত্তিতে জনগণ তাঁকে নির্বাচিত করেছেন, তা লঙ্ঘন করেন তখনই তাঁর পদত্যাগের দাবি ওঠে।

গণতন্ত্রকে নিছক ‘ব্যালট বাক্সে’ বন্দি করলে গণতন্ত্রের প্রাণসত্তাকেই হরণ করা হয়; কোনও স্বৈরাচারী সরকার যদি ধর্মের আবরণে তার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে আড়াল করে এবং দক্ষিণপন্থী পুঁজিবাদী মানসিকতা থেকে ফ্যাসিস্ট শাসন চালায়, তবে তার বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ করার অধিকারকে অস্বীকার করা হয়।

প্রশ্ন ঃ মিশরের বর্তমান ঘটনাবলী সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী?

সালেহ আদলে ঃ ২০১১-এর জানুয়ারি বিপ্লবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতবাক হয়ে গেছে। যদিও মিশরে পটপরিবর্তন যে হতে পারে সে-ব্যাপারে তারা তৈরি ছিল। তারা বুঝেছিল মোবারকের সরকার বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছে। মোবারক উৎখাত হওয়ার সাথে সাথেই তারা ঘটনাক্রমে হস্তক্ষেপ করে, পুরনো সামরিক কাউন্সিল ও মুসলিম ব্রাদারহুডের একটা আঁতাত গড়ে তোলে এবং মুসলিম ব্রাদারহুড মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করবে, ইজরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং জনস্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নয়া উদারনৈতিক আর্থিক নীতি চালু রাখবে — এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরই তারা মুসলিম ব্রাদারহুডকে সমর্থন দেয়।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা বুঝতে পারে মুসলিম ব্রাদারহুড শাসন চালাতে অক্ষম, তাদের যোগ্য লোকের অভাব আছে। তারা উদারনৈতিক শক্তিগুলির তুলনায় জেহাদি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে আঁতাতে বেশি আগ্রহী।

মার্কিন সরকার বিশেষভাবে চাইছিল, মার্কিন আনুগত্য নিশ্চিত করতে নানা সামরিক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ও সুযোগসুবিধা বহাল রাখতে।

কিন্তু যেভাবে মিশরে প্রতিবাদ বেড়ে উঠছিল এবং জনগণ মুসলিম ব্রাদারহুডকে শাসনক্ষমতা থেকে খারিজ করতে চাইছিল, তাতে মিশরের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ভয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আতঙ্কিত ছিল।

তাই তারা সংস্কার কর্মসূচি কার্যকর করার জন্য মুসলিম ব্রাদারহুডের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। বিরোধীদের মধ্যে যারা উদারনৈতিক শক্তি, যারা বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ দেখে, যেমন ওয়াফদ পার্টি, ফ্রি ইজিপ্সিয়ান পার্টি এবং কনস্টিটিউশন পার্টির ওপরও চাপ দেয় যাতে তারা বামপন্থীদের সঙ্গে ঐক্য ভেঙে দেয় এবং যুবআন্দোলনের বিপ্লবী মেজাজ খারিজ করে দ্রুত পার্লামেন্টারি ইলেকশনের দিকে যায়। যুবশক্তি মনে করছিল বিরাট গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ও নির্বাচন বয়কট করে মুসলিম ব্রাদারহুডকে ক্ষমতাচ্যুত করাই বিপ্লবের লক্ষ্য পূরণের একমাত্র পথ।

মুরসির ক্ষমতাসীন থাকার ন্যায্যতা প্রত্যাহার করে নেওয়া সম্পর্কে তামারুদ (বিদ্রোহ)-এর ধারণা সফল হওয়ার পর যখন ব্যাপক জনগণ ও রাজনৈতিক শক্তিগুলি তাতে সাড়া দেয়, সকলেই কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়ে। এর দ্বারা সব রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলির দোদুল্যমানতা কেটে যায়, তারা জনগণের ইচ্ছার সমর্থনে দাঁড়িয়ে মুরসির আশু পদত্যাগ ও দ্রুত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দাবি তোলে।

মুসলিম ব্রাদারহুডের শাসনের অবসান, সংবিধান সংশোধন ও নতুন ন্যায্যতার ভিত্তিতে বিপ্লবের গতিধারা সংশোধন ও সঠিক ভিত্তিতে নতুন অন্তর্বর্তী পর্যায়ের কর্মসূচি সংশোধনের দাবি তীব্রতর হতে থাকে।

এই সব দাবিতে জনসমর্থন যে এত বিশাল আকার নিতে পারে এবং জনগণের ইচ্ছানুযায়ী চলতে সকলকে বাধ্য করতে পারে তা মুসলিম ব্রাদারহুড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সেনাবাহিনী এমনকী বিরোধী রাজনৈতিক দল, শক্তিগুলি এবং যুবশক্তি কল্পনাও করতে পারেনি।

আমরা জানি, জনমতকে উপেক্ষা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর শীর্ষকর্তাদের ও উদারনৈতিক রাজনৈতিক শক্তিগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে যাতে মুরসিকে উৎখাত না করা হয় ও বড় ধরনের সংস্কার কর্মসূচি চালু থাকে। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, জনগণ পথে নেমে পড়েছে। এই অবস্থায় কোনও বিকল্প চালু করা মানেই হচ্ছে, গৃহযুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদ ও সংকীর্ণতাবাদকে বাড়িয়ে তোলা এবং বিদেশি হস্তক্ষেপ ডেকে আনা।

এই সংকটজনক পরিস্থিতিতেই মুরসির সরকার উৎখাত হয় এবং বিপ্লবের লক্ষ্য পূরণকে সামনে রেখে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে। এটাও লক্ষণীয় যে, এই প্রথম মিশরীয় সেনাবাহিনী মার্কিন হুকুম অমান্য করল, কারণ তারা বুঝেছিল যে, এর ফলে বিরাট বিপদ দেখা দেবে যা তাদেরই ক্ষতি ডেকে আনবে। বিপ্লবকে যদি তারা সমর্থন না করে তবে মাতৃভূমির ক্ষতি হবে।

জাতীয় ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিও বুঝতে পারে সেনাকর্তাদেরও নিজস্ব স্বার্থ ও সুযোগসুবিধা আছে যা তারা ছাড়তে নারাজ, সরাসরি রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করেও রাজনীতিতে তারা একটা ভূমিকা রাখতে চায়। এই পর্যায়ে এদিকটি সম্পর্কে আমরা সচেতন বলেই মনে করি যে, পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে এগুলি কাটিয়ে ওঠা হবে।

আমাদের ধারণা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে দেশদ্রোহিতা, হানাহানি চায় এমন গোষ্ঠীগুলিকে মদত দিয়ে তাদের ‘ক্রিয়েটিভ ক্যাওস’ পরিকল্পনাকে সফল ও মিশরকে দ্বিতীয় ইরাক বানাতে চায়। তারা যে এই পথেই হাঁটছে তা ৫ জুলাইয়ের চক্রান্তেই ফাঁস হয়েছে। যুবশক্তি এই চক্রান্তের নাম দিয়েছে মিশরের জনগণের বিরুদ্ধে ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইজরায়েল-মুসলিম ব্রাদারহুডের আগ্রাসন’।

এই চক্রান্তের লক্ষ্য হল, বিপ্লবের সাফল্যকে ভেস্তে দেওয়া, মুরসিকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা, মিশরের বুকে অভূতপূর্ব মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জনগণ ও খোদ সেনাবাহিনীর মধ্যে ফাটল ধরানো, যেমনতেমনভাবে জনগণকে মিছিলে নামিয়ে বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সন্ত্রাস ও অস্ত্রের জোরে আজাদ চক দখল করা। তারপর গাজার ইসলামিক গোষ্ঠীগুলি ও ইজরায়েলের সঙ্গে যোগসাজসে, সিনাইয়ের জেহাদি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মিলে চক্রান্ত করে আজাদ চককে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করা।

এই সংকটকালে কায়রোর নাস্রে শহরে রাব্বাইয়া আল-আদাভি চকে ফ্যাসিবাদী মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা তাদের সমর্থকদের সামনে যে সন্ত্রাস ও ভয় দেখানো বক্তব্য রেখেছেন, তা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা বড় ষড়যন্ত্রের সংকেত। সি এন এন এবং বি বি সি টিভি চ্যানেলের আরবি সার্ভিস এই ষড়যন্ত্রে বিপজ্জনক ভূমিকা পালন করছে।

কিন্তু জনগণ ও সেনাবাহিনী তাদের চক্রান্তের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম। তারা দেশ ও জনগণের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মুসলিম ব্রাদারহুডের বেইমানি ফাঁস করে দিয়েছে। এর ফলে এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরিকল্পনা বড় রকম ধাক্কা খেয়েছে। প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শক্তির বিজয়কে আরও সুনিশ্চিত করেছে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের দলের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ কী কী, বিশেষত অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐক্য করার ক্ষেত্রে।

উত্তর ঃ আজ যে বিরাট কর্তব্য আমাদের সামনে রয়েছে তাতে প্রধান চ্যালেঞ্জ হল বামপন্থীদের ঐক্য গঠন করা।

আমাদের প্রধান কর্তব্যগুলি হল ঃ

- অন্তর্বর্তী পর্যায়ের কর্মসূচি ও লক্ষ্য পূরণ করা।
- আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির একজন সর্বসম্মতপ্রার্থী মনোনীত করে নির্বাচনে লড়াই করা।
- বামপন্থী শক্তিগুলি, নাসেরবাদী, যুব আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির একটি ফ্রন্ট গড়ে তোলা। আগামী পার্লামেন্টারি ও আঞ্চলিক নির্বাচনগুলিতে লড়ার জন্য যৌথ তালিকা তৈরি করা। অন্তর্বর্তী পর্যায়ে বিপ্লবের গতিধারাকে সংশোধন করার পথ থেকে পশ্চাদপসরণ না করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা।
- পার্টির কাঠামোকে সম্পূর্ণ করা, পার্টিতে নতুন প্রজন্মকে যুক্ত করা এবং যে বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন আমরা হয়েছি তা গ্রহণ করার উপযুক্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা করা।

(মিশরের পরিস্থিতি বুঝতে সহায়তা করবে মনে করেই এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করা হয়েছে এবং একে মিশর পার্টির অভিমত রূপেই গণ্য করতে হবে)

ভ্রম সংশোধন *ঃ গণদাবী ৬৬ বর্ষ ৮ সংখ্যায় কমরেড অরুণ দেবনাথের জীবনাবসানের সংবাদে ভুলক্রমে স্মরণসভার তারিখ ৭ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ৭ আগস্ট ছাপা হয়েছে। এই ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।*

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

প্রেসিডেন্সির দখল নিতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে তৃণমূল

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব ও শতবর্ষ প্রাচীন বেকার ল্যাবরেটরি ভাঙচুরের অন্যতম মূল সাক্ষী ঐ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তারক্ষী পাপ্পু সিং-কে বদলি করে দিল রাজ্য সরকার। ১০ এপ্রিল এক তৃণমূল কাউন্সিলারের নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সি কলেজে হামলা চালিয়েছিল তৃণমূল বাহিনী। উদ্দেশ্য ছিল বিরোধী সংগঠনের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। পাপ্পু সিং সেই সময় গেটে পাহারার দায়িত্বে ছিলেন। বহু বছর ধরে ঐ জায়গায় কাজ করার সুবাদে তিনি এলাকার অনেককেই চিনতেন। রাজ্য মানবাধিকার কমিশন নিযুক্ত তদন্ত কমিটির প্রধান, প্রেসিডেন্সিরই প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমল মুখোপাধ্যায় এবং পুলিশের কাছে তিনি হামলাকারীদের অনেককেই চিহ্নিত করেন। অতএব, শাসক দলের কোপে পড়ে যান তিনি। তাঁকে বদলি করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। এমনকী অশিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা কম বলে উপাচার্য এই বদলিতে আপত্তি জানালেও শিক্ষা অধিকর্তা থেকে শিক্ষামন্ত্রী, সকলেই এ বিষয়ে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

পাপ্পু সিং-এর সাথেই আরও ১৩ জন অশিক্ষক কর্মচারীর বদলির আদেশ হয়েছে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আপত্তি উপেক্ষা করে এই বদলির আদেশ কার্যকরী করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। প্রেসিডেন্সি, সরকারি কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর রাজ্য সরকার কর্মীদের সুযোগ দিয়েছিল সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী হিসাবে থাকতে চায়, নাকি অন্য কোনও সরকারি কলেজে বদলি হতে চায় এ বিষয়ে পছন্দ জানিয়ে অপশন ফর্মপূরণ করার। এই অপশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল গত ১৮ সেপ্টেম্বর। কিন্তু তার আগেই ৩ সেপ্টেম্বর বদলির আদেশ জারি করে দেয় শিক্ষাদপ্তর।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষাদপ্তরকে জানিয়েছিলেন বিধি অনুযায়ী অপশন ফর্মগুলি আগে যাচাই করা হোক। কিন্তু ওসব কথায় কর্ণপাত না করে প্রেসিডেন্সি থেকে কর্মী বদলি করে শূন্যতা সৃষ্টির জন্য সরকার উঠেপড়ে লেগেছে।

এই কর্মী বদলি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৃণমূল অশিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে নিজেদের লোক ঢোকাতে চাইছে, এ কথা স্পষ্ট। তৃণমূল ছাত্রপরিষদের এক কার্যকরী সভাপতি বলেছেন 'প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কোনও শক্তি নেই। অদূর ভবিষ্যতেও সোজা পথে তা গড়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই আমরা অশিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে নিজের লোক ঢোকাতে চাই।' 'ছাত্র-রাজনীতির খোঁজ যারা রাখেন তারা বুঝবেন অশিক্ষক কর্মচারীরা হাতে থাকলে কীভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দখল করা যায়।' (হিন্দুস্তান টাইমস, ২১-০৯-২০১৩)

পাপ্পু সিং ১০ এপ্রিলের ঘটনার মূল সাক্ষী বলেই তাঁকে সরানোটা হয়ে উঠেছিল সরকারের অন্যতম প্রধান মাথা ব্যথা। যে কারণে তাঁর বদলির আদেশে সই হয়েছে সবচেয়ে আগে। তার বহু পরে যুক্ত হয়েছে অন্যদের নাম। উল্লেখ্য যে, পাপ্পু সিং সহ বদলি হওয়া ১৪ জন কর্মীর কেউই বদলির অপশন দেননি। তা হলে সরকারের এত তাড়াহুড়ো কেন? যে কথা বলেছেন প্রেসিডেন্সির প্রাক্তন অধ্যক্ষ শিক্ষাবিদ অমল মুখোপাধ্যায়। তাঁর মতে, শাসকদল একদিকে তাদের প্রশ্রয়পুষ্ট গুণ্ডাদের আড়াল করতে পাপ্পু সিং-কে সরিয়ে দিতে চেয়েছে, পাশাপাশি প্রেসিডেন্সিতে অশিক্ষক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে শূন্যতা সৃষ্টি করে তড়িঘড়ি অস্থায়ীভাবে নিয়োগের নামে নিজেদের লোক ঢোকাতে চাইছে। এর মাধ্যমেই ধীরে ধীরে দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চাইছে এই প্রতিষ্ঠানের উপর। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা সিপিএম এই রকমই নানা ধূর্তামির মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলবাজি কায়েম করেছিল। তৃণমূল সেই পথেই হাঁটছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার ভঙ্গের এ এক অতি জঘন্য উদাহরণ। শিক্ষানুরাগী মানুষ, প্রেসিডেন্সির সাথে যুক্ত শিক্ষাবিদ, ছাত্ররা তাই দাবি করেছেন—এই বদলি অবিলম্বে রদ করা হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী নিয়োগ থেকে বদলি সহ সমস্ত ব্যাপারে সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষাবিদদের কমিটির হাতেই অর্পণ করতে হবে। কিছুদিন আগেও সরকার এবং কর্পোরেট মিডিয়ার প্রচারে প্রভাবিত হয়ে অনেকে ভাবছিলেন প্রেসিডেন্সিকে তথাকথিত অটোনমাস ইনস্টিটিউশন বলে ঘোষণা করলেই শিক্ষার উন্নতি হবে। প্রেসিডেন্সির ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এই প্রচার আসলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কুক্ষিগত করারই ছক।

র‍্যাগিং সমর্থনযোগ্য নয় ঃ ডি এস ও

সম্প্রতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং-এর ঘটনা এবং তাকে কেন্দ্র করে ছাত্র অসন্তোষ ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায় ২০ সেপ্টেম্বর বিবৃতিতে বলেন,

'সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়, শ্রীরামপুর টেক্সটাইল কলেজ সহ রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমস্ত ছাত্র র‍্যাগিংয়ের ঘটনাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই। ছাত্র র‍্যাগিংয়ের মতো একটা অমানবিক ঘটনাকে সমাজের কোনও স্তরের মানুই সমর্থন করতে পারেন না। আমরা সর্বত্র ঘটে চলা র‍্যাগিংয়ের পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে ঘেরাও আন্দোলন চলছে তার সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা মনে করি ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির একটি ছাত্রের সাথে র‍্যাগিংয়ের যে ঘটনার অভিযোগ উঠেছে তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।'

প্রকাশিত হচ্ছে
সংকট থেকে মুক্তি শুধু সমাজতন্ত্রই দিতে পারে
প্রভাস ঘোষ
(২৪ এপ্রিল ও ৫ আগস্ট ২০১৩-র ভাষণ)

মিথ্যা অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পেলেন গণআন্দোলনের কর্মীরা

অবশেষে মিথ্যা অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেন গণআন্দোলনের ১২ জন এস ইউ সি আই (সি)কর্মী। ২০০৮ সালের ২৪ নভেম্বর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে হাতিবাগান সহ কলকাতার বিভিন্ন স্থানে এবং রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে। এর মধ্যে হাতিবাগানে বিক্ষোভ কর্মসূচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ ব্যাপক লাঠি চালায় এবং তিন জন মহিলা কর্মী সহ ১২ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে। পুলিশ ও জেল হেফাজতে সাত দিন আটক থাকার পর কর্মীদের জামিন হয়। তারপর দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এই মিথ্যা মামলায় হয়রানি চলতে থাকে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে এই মামলার নিষ্পত্তি হয়। প্রমাণাভাবে বিচারক তাঁদের বেকসুর খালাস দেন।

সিপিএম শাসনে জনগণের দাবি নিয়ে গণআন্দোলনের প্রায় প্রতিটি কর্মসূচিতেই এই ধরনের মিথ্যা মামলা প্রায় দস্তুর হয়ে উঠেছিল। সেই সমস্ত মামলায় আমাদের দলের কয়েক হাজার কর্মী আজও হয়রান হচ্ছেন, অত্যন্ত জনপ্রিয় জননেতা, বিধানসভায় ন'বারের বিজয়ী প্রবীণ কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সহ ৪৯ জন কর্মী মিথ্যা অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন। এমনকী সাধারণ মিছিল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে অস্ত্র পাওয়া গেছে বলে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজাতেও পুলিশের আটকায়নি। পাঁচের দশক-ছয়ের দশকে কংগ্রেস সরকার বামপন্থী গণআন্দোলনকে দমন করতে নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরত। এমনকী মূল্যবৃদ্ধি, ভাড়াবৃদ্ধি প্রভৃতি ঘোষণার আগেই নেতাদের গ্রেপ্তার করে জেলে পুরত। বর্তমান তৃণমূল শাসনেও শাসকের ভূমিকার পরিবর্তন হয়নি। সিপিএম সরকারের আমলে যে পুলিশ অফিসাররা এই সব দুষ্কর্ম চালিয়ে গেছে তারা এখন পুরস্কৃত হচ্ছেন। কেউ কেউ মন্ত্রীও হয়েছেন। তৃণমূল শাসনের শুরুতেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে মিছিল করার অভিযোগে দলের ছাত্রনেতাদের পুলিশ যে অপহরণের মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিল তা যেমন আজও চলছে, তেমনই গত ১৪ মে বউবাজারে আইন-অমান্যের ঘোষিত কর্মসূচি থেকে সাত জন ছাত্রকে তুলে নিয়ে গিয়ে জামিন অযোগ্য ধারা দেওয়া হয়েছে। এই মিথ্যা অভিযোগে তাঁদের বেশ কয়েক দিন পুলিশ হেফাজতে থাকতে হয়েছে। শাসকের রঙ বদলালেও স্বভাব বদলায় না।

ভাগলপুরে ছাত্র যুব মহিলাদের বিক্ষোভ

মহিলাদের ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ, খুন, আক্রমণ রোধ, মদের প্রসার বন্ধ প্রভৃতি দাবিতে বিহারের ভাগলপুরে ৮ সেপ্টেম্বর ছাত্র যুব মহিলাদের বিক্ষোভ

মেট্রো স্টেশনের টিভিতে রুচিহীন অনুষ্ঠান পরিবেশকে কলুষিত করছে

বেশ কিছুদিন ধরে মেট্রো রেল স্টেশনের অভ্যন্তরে টিভিতে রুচিহীন নাচ-গান ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে। অবিলম্বে তা বন্ধ করার দাবিতে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজারের সেক্রেটারি এস কে ঘটকের কাছে এ আই ডি ওয়াই ও কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এ ছাড়া ট্রেন ঢোকা এবং কর্তৃপক্ষের ঘোষণার সময় টিভি বন্ধ রাখা ও শব্দবিধি মেনে চলার বিষয়টি তার নজরে আনা হলে তিনি তা মেনে নেন।

রুচিহীন নাচ-গানের বিষয়টিও তিনি বিবেচনা করবেন বলে প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে তাঁকে বলা হয়, যদি এ বিষয়ে কোনও উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তা হলে জনমত সংগঠিত করে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে তাঁরা বাধ্য হবেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in